বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

মে ২০১৭

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

(Buddha's Observation of Truth : A Theoretical Explanation)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

কুরাইশা বিন্‌তে কুদ্দুস

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. বেলু রানী বড়ুয়া

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মে ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

গৃহীত গবেষণাকর্মের পরিচিতি সম্পর্কে প্রারম্ভিক ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ১-৬

প্রথম অধ্যায় : সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম পরিচয় ৭-৪১

জন্ম পরিচয় ৭-১৮

ভবিষৎবাণী ১৮-২১

বাল্য জীবন ২২-৩১

টীকা ও তথ্য নির্দেশ ৩১-৪১

দ্বিতীয় অধ্যায় : বুদ্ধত্ব লাভ ৪২-৯৪

নিমিত্ত দর্শন ৪২-৪৭

গৃহত্যাগ ৪৮-৫৪

বুদ্ধত্ব লাভ ৫৫-৭৩

মহাপরিনির্বাণ ৭৩-৮৪

টীকা ও তথ্য নির্দেশ ৮৫-৯৪

তৃতীয় অধ্যায় : সত্যানুসন্ধান ৯৫-১২৯

আর্যসত্য ৯৫-১০৪

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ ১০৫-১১০

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি ১১১-১১৬

নির্বাণ ১১৭-১২৭

টীকা ও তথ্য নির্দেশ ১২৮-১২৯

চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার ১৩০-১৩৭

টীকা ও তথ্য নির্দেশ ১৩৮

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৯-১৪৪

ক. বাংলা, পালি ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থসমূহ ১৩৯-১৪১

খ. পালি ইংরেজী গ্রন্থসমূহ ১৪২-১৪৩

অভিধান ১৪৪

জার্নাল ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

wb‡e‘b

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগে ২০০৭-০৮ সেশনে ১ম বর্ষে ভর্তি হই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম থেকেই আমার উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করার সুপ্ত ইচ্ছা ছিল। আর সেই সুপ্ত ইচ্ছার প্রতিফলনই আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা। জীবনের বাস্তবতায় নানা রকম প্রতিকূলতা তথা বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও আমার বাবা মোঃ আব্দুল কুদ্দুস ও মা মানসুরা বেগম আমার পাশে থেকে আমাকে সব সময় প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি সর্বদা আমার বাবা-মার কাছ থেকে প্রোৎসাহিত হয়েছি সতত। এক্ষেত্রে আমার বাবা-মার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার গবেষণার শিরোনাম হলো- "বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ"। এ বিষয়ে আমাকে প্রথম আগ্রহী করেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. বেলু রানী বড়ুয়া। তাঁর নিরন্তন প্রেরণা ও উৎসাহে আমি এ এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হই। অভিসন্দর্ভ রচনার শুরুতে আমার হতাশা আর অপ্রাপ্তির যোগ ছিল। কিন্তু আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. বেলু রানী বড়ুয়া'র নির্মল গভীর সুচিন্তিত পরামর্শ, প্রজ্ঞাময় নির্দেশনা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা আমার গবেষণাকর্মকে সহজ করে দিয়েছে। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া গবেষণার বিষয় পরিকল্পনা তৈরি করে প্রতিটি অধ্যায় সযত্নে পর্যালোচনা করে সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও আন্তরিক সহযোগিতাই ছিল আমার গবেষণার প্রেরণা। তাঁর আন্তরিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হই। এছাড়াও আমার অন্যতম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারি প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া এ অভিসন্দর্ভের পাঠ-পরিকল্পনা, পরিমার্জন, পরিশীলন ও সংশোধনে আমাকে বিশেষভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। আমার বর্তমান এ অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক রূপ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে প্রফেসর ড. বেলু রানী বড়ুয়া ও প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়ার সতত সুন্দর উৎসাহ প্রদান তথা অনন্য সাধারণ অনুপ্রেরণা আমি অতীব শ্রদ্ধা, বিনয় এবং কৃতজ্ঞ চিত্তে সর্বদা স্মরণ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের উভয়ের অপরিসীম স্নেহ-মমতায় ধন্য ও অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ।

এক্ষেত্রে আরও একজন মানুষের অবদানের কথা না বললেই নয়। আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অনুপ্রেরণার উৎস, কাছের মানুষ, বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী দেলোয়ার হোসেন রনি- যার উৎসাহেই আমি

আমার উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করার সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তিনি যথাসাধ্য তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, নিজ বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগার, আমার তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার, ঢাকার পাবলিক গ্রন্থাগার, বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন আর্কাইভ ব্যবহার করেছি। এক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও অভিসন্দর্ভ রচনা ও প্রস্তুতকরণে যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে উপকৃত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ। অভিসন্দর্ভটি নির্ভুল করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। এই ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্তে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে প্রত্যাশা করি।

KivBkv web‡Z Kïm
এম.ফিল. গবেষক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qb cÎ

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, কুরাইশা বিন্‌তে কুদ্দুস (রেজিঃ নং- ১৯৩) আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে তার এম.ফিল. ডিগ্রীর গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করেছে। তার অভিসন্দর্ভের বিষয় 'বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক- এ অভিসন্দর্ভে তার মননশীল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে গবেষকের বীক্ষন এবং উপযুক্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই অভিসন্দর্ভটি একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে। অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি। অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা করা হল।

আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি এবং প্রস্তাবিত ডিগ্রী অর্জিত হোক এ প্রত্যাশা করি।

c‡dmi W. †ej ivbx eoqv
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

বৌদ্ধ ধর্ম হল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম বুদ্ধ যিনি মহামানব নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মানবজাতির সত্যপথের একজন পথ-প্রদর্শক ও পথ-নির্দেশক ছিলেন। তিনি বর্ণ প্রথা ও জাতিভেদের উর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবজাতি ও জীবগণের কল্যাণে অহিংস বাণী প্রচার করেছিলেন। ভারতের বাইরে অধিকাংশ দেশে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতে ব্রাহ্মণেরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যাগযজ্ঞ ছাড়াও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বর্ণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস- এ চারটি প্রথা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে। ভৌতিক ও নাস্তিকতাবাদী মতানুযায়ী কর্ম, কর্মফল ও জন্মান্তর অস্বীকার করা হয়। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে কতগুলো প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যারা বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম হল এই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলোর অন্যতম। গৌতম বুদ্ধ ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন যা জনসাধারণকে বিশেষভাবে আলোকিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। বুদ্ধ অতিরিক্ত ভোগবিলাস ও অতিরিক্ত কৃচ্ছসাধন- এই উভয় মতের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্ম-দর্শন মধ্যম পন্থার উপর নির্ভরশীল। নৈতিক বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে দুঃখজয়ের মার্গ বা নির্বাণ লাভই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।

অট্ঠকথাসমূহে বিশেষ করে জাতকট্ঠকথায় গৌতম বুদ্ধের ৫৩০ জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল একটি উজ্জ্বল সাহিত্যকীর্তি। স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত বাণীসমূহ মহিমায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান বলতে তাঁর সত্যপথের অনুসন্ধিৎসা অর্থাৎ তাঁর সাধনার মাধ্যমে গভীর তত্ত্ব 'নির্বাণ' এর অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধি বুঝায়। বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্যের পথই হল সত্যের অনুসন্ধান।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম- পরিচয়, বাল্যজীবন, ভবিষ্যৎ বাণী। সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্য বংশের রাজা ছিলেন। কপিলাবস্তু নগরটি শাক্যদের রাজধানী নামে পরিচিত। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানের শালবৃক্ষের নীচে বৈশাখী পূর্ণিমা

Dhaka University Institutional Repository

তিথিতে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ সালে রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই সিদ্ধার্থ গৌতম চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। ঋষি কালদেবল ধ্যানযোগে জানতে পারলেন- জগতের ভাবী বুদ্ধ ধরাধমে অবতীর্ণ হয়েছেন শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে। সংসার জীবনে আকৃষ্ট করার জন্য রাজা শুদ্ধোদন সমগোত্রীয় এক সুন্দরী নারীর সাথে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের পত্নীর নাম ছিল গোপা বা যশোধরা। সিদ্ধার্থ বিবাহের পর কিছুদিন সংসারে আবদ্ধ ছিলেন।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ত্ব লাভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নিমিত্ত-দর্শন, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ত্ব লাভ, মহাপরিনির্বাণ সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংসারের দুঃখ-কষ্ট যাতে চোখে না পড়ে সেদিকে তাঁর পিতা খুব সজাগ ছিলেন। কিন্তু তারপরও রাজকুমার সিদ্ধার্থ চার নিমিত্ত দর্শন করলেন। কুমার সিদ্ধার্থের চার নিমিত্ত দর্শন হল– ক্ষীণকায় দুর্বল, শীর্ণ দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তির দর্শন, রাস্তার ধারে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শন, শবদেহ (মৃত দেহ) দর্শন, সন্ন্যাস দর্শন- রাজকুমারের জীবনের পরিবর্তনের জন্য এই চার নিমিত্ত দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার নিমিত্ত দর্শনের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুর্গতি দেখে বিচলিত হলেন এবং কিভাবে এসব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়- সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করল। একে উদীয়মান বিবেকরূপ চন্দ্রকে গ্রাসের নিমিত্ত ভেবে তিনি পুত্রের নাম রাখলেন রাহুল। রাহুলের জন্মের পর তিনি নিজেকে আর সংসার জীবনে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সে (৫৯৪ খ্রিঃ পূঃ) এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথির গভীর রাতে চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হয়ে পড়লেন।

তিনি বৈশালীতে নির্গ্রন্থ প্রমুখ নানা সম্প্রদায়ের মুনি ও ঋষিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেও মুক্তি-পথের সন্ধান পেলেন না। এ সময় তিনি শ্রাবস্তী হয়ে রাজগৃহে যাবার পথে মগধরাজ বিম্বিসারের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরে গয়ার নিকটে তিনি কঠোর কৃচ্ছসাধনে রত হন। তাঁর শরীরই শুধু ধ্বংস হতে লাগল - কোন অগ্রগতি হল না। এভাবে ছয় বছর অতিবাহিত হতে দেখে তিনি বুঝলেন– কৃচ্ছসাধনের দ্বারা তেমন কিছু ফল হবে না। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম মধ্যম পন্থা গ্রহণ করে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে পুনরায় গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা পায়াসন্ন দিয়ে তাঁর সেবা করেন। ফলে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে (৫৮৮ খ্রিঃপূঃ) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি 'বোধি' বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বুদ্ধত্ত্ব লাভ করে জগতে

বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। বুদ্ধত্ত্ব লাভের পর বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রচার করতে লাগলেন। জনগণের মঙ্গল ও উপকারার্থে গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ভারত, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন জনপদে অবিশ্রান্তভাবে স্বীয় ধর্মপ্রচার করেছেন। এভাবে দীর্ঘ প্রায় চার যুগ ধর্মপ্রচার করার পর আশি বছর বয়সে ৫৪৩ খ্রিষ্টপূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আর্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, নির্বাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চার আর্যসত্যের মধ্যেই বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূলকথা নিহিত। চতুরার্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা তথা মূলকথা। বুদ্ধের ধর্ম ও চার আর্যসত্য উভয়ের মূল বা সারকথা হচ্ছে কার্যকারণ নীতি বা শৃঙ্খলা। দুঃখকেই প্রথম ও প্রধান সত্য বলা হয়েছে। কারণ, জগতে দুঃখ অপেক্ষা বড় কোন সত্য নেই। দুঃখ মানুষকে সর্বদা কষ্ট দেয়। দুঃখের হেতু বা কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য। কারণজাত দুঃখের নিবৃত্তি আছে- এটা তৃতীয় আর্যসত্য। দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বুদ্ধের প্রচারিত চার আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ- এ দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদের মাধ্যমেই বুদ্ধ জীবন ও জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের আধার বা আশ্রয়। বৌদ্ধধর্মে মানব জীবনের চরম মুক্তি বা দুঃখের অন্তিম নিরোধ অর্থে নির্বাণকে বোঝানো হয়েছে। নির্বাণ লাভে বাসনা ও জীবনের অবসান ঘটে। নির্বাণ এমন এক অমৃত পদ যা পরম শান্তিপ্রদ এবং পরম সুখকর। প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান সম্পর্কে সার সংক্ষেপ ও নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সিদ্ধার্থ গৌতম জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনের জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন এবং বুদ্ধ হন। আর্যসত্যই হচ্ছে মূল যার অভ্যন্তরে বুদ্ধবাণীর অন্তঃসার নিহিত। মহামতি বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত সর্বজনীন উপদেশ-এ ত্রিবিদ্যার মধ্যেই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অর্থাৎ কার্য-কারণ নীতি, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও নির্বাণ এর সমন্বয় ঘটেছে। মহাকারুণিক বুদ্ধের এ বাণীর প্রতিফলন হলেই বিমুক্তি-সুখ অর্থাৎ নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

fwgKv

মানব জাতির জানা-অজানা বহু ধর্মের উৎপত্তিস্থল হল এশিয়া মহাদেশ। এই এশিয়া মহাদেশে বিভিন্ন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার বহু ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছে। তেমনি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মহান ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম। এই মহান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম বুদ্ধ। মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ যিনি বিশ্বজোড়া 'মহামানব' নামে খ্যাত, তিনি শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রবর্তকই ছিলেননা; তিনি ছিলেন মানবজাতির সত্যপথের একজন পথ প্রদর্শক ও পথ নির্দেশক। তিনি ধর্ম প্রচারের শুরুতেই অখন্ড মানবতা ও মানবপ্রেম প্রদর্শনের লক্ষ্যে সেদিনের প্রচলিত বর্ণপ্রথা ও জাতিভেদের উর্ধ্বে উঠে - সমগ্র মানবজাতি ও জীবগণের কল্যাণে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেটি ছিল অভূতপূর্ব যা সকলের জন্য মানবিক আবেদনে পরিপূর্ণ, জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর। বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বেশাম বলেছেন, বুদ্ধ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান। আবার অন্যদিকে পন্ডিত কোশাম্বী মহামতি গৌতম বুদ্ধকে বিদেশীদের নিকট শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন- ভারতের বাইরে এশিয়ায় প্রায় সব দেশে গৌতম বুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবকালে ভারতে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, ধর্মীয় কঠোরতা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যয়বহুল আড়ম্বর, সমাজ জীবনের চারটি আশ্রম প্রথা- যেমন: ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এবং দার্শনিক গুরুগম্ভীর তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় না হয়ে উৎপীড়নে পর্যবসিত হয়। সমাজে বহুবিধ যাগযজ্ঞ, বলি ইত্যাদির মাধ্যমে একদিকে দেবদেবী ও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি বিধান আর অন্যদিকে ভৌতিক ও নাস্তিকতাবাদী মতানুযায়ী কর্ম, কর্মফল ও জন্মান্তর প্রভৃতিকে অস্বীকার করার স্রোতধারা চলতে থাকে। বৈদিক যুগের শেষ দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন অনুসন্ধিৎসা শুরু হয় তৎকালীন উত্তর ভারতে। উপ-নিষদে এর প্রতিফলন দেখা যায়। তখন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে কতগুলো প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যারা বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যকে অস্বীকার করেছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম হল এই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ধর্ম সর্বপ্রথম প্রসার লাভ করে প্রধানত: গাঙ্গেয় উপত্যকায় অপেক্ষাকৃত আর্যপ্রভাব মুক্ত পূর্বভারতে অর্থাৎ বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে। সে যুগে গৌতম বুদ্ধ ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুনত্বের সূচনা করেছিলেন– যা জনসাধারণকে প্রবলভাবে আলোকিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনই তাঁর ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য

ছিল। তিনি অতিরিক্ত ভোগবিলাস ও অতিরিক্ত কৃচ্ছসাধন উভয় মতের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্মদর্শন মধ্যম পন্থার উপর নির্ভরশীল কতকগুলো নৈতিক বিধান বিশেষ। এ বিধানগুলোকে বুদ্ধ দুঃখজয়ের মার্গ বা নির্বাণ গমনের পথ বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতজনের কাছে তিনি সহজ সরলভাবে এসব ধর্মকথা বর্ণনা করতেন এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করেছিল।

পালি অট্ঠকথাসমূহে মহামতি গৌতম বুদ্ধের জীবনী সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। অট্ঠকথাকারগণ তাঁদের রচিত অট্ঠকথায় বিশেষ করে জাতকট্ঠকথায় গৌতম বুদ্ধের ৫৩০ জন্মের কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে বুদ্ধ ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম হল একটি উজ্জ্বল সাহিত্যকীর্তি। কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে একটি মর্যাদাবহুল বিষয়। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর প্রচারিত বাণীসমূহ মহিমায় সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান বলতে ভগবান বুদ্ধের সত্যপথের অনুসন্ধির্ষা অর্থাৎ তাঁর সাধনার মাধ্যমে গভীর তত্ত্ব 'নির্বাণ' এর অন্তর্নিহিত ভাবের উপলব্ধি। বুদ্ধের আবিষ্কৃত সত্যের পথই হল সত্যের অনুসন্ধান। ইতোপূর্বে বুদ্ধ এবং তাঁর সত্যানুসন্ধান বিষয়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর পরিপূর্ণ রূপ, তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে সন্নিবেশিত হয়নি।

বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ- এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম-পরিচয়, বাল্যজীবন, ভবিষ্যৎবাণী। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম-পরিচয়ের মধ্যে মহামায়াদেবীর স্বপ্নদর্শনে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মাতৃগর্ভধারণ, মাতৃগর্ভ থেকে সিদ্ধার্থ গৌতমের অভিনব জন্ম, রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মস্থান, রাজকুমার সিদ্ধার্থের নামকরণ, কুমার সিদ্ধার্থ সম্পর্কে ঋষি কালদেবলের ভবিষ্যদ্বাণী, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী, কুমার সিদ্ধার্থের বাল্যজীবনে বহুবিধ বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য, বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে কপিলাবস্তু নগর সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। সিদ্ধার্থ গৌতম একজন ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুদ্ধোদন শাক্যবংশের প্রধান অর্থাৎ শাক্যবংশের রাজা ছিলেন। বর্তমান নেপালের দক্ষিণভাগে গোরক্ষপুরের সন্নিকটে কপিলাবস্তু নামে এক নগর ছিল। এই

Dhaka University Institutional Repository

নগরটি শাক্যদের রাজধানী নামে পরিচিত। মহারাজ শুদ্ধোদন পত্নী মায়াদেবীর পিত্রালয়ে গমনকালে কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানের শালবৃক্ষের নীচে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ সালে রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। শৈশবকাল থেকেই রাজকুমার সিদ্ধার্থের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কোন অভাব ছিল না। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হলেও বাল্যকাল হতে সিদ্ধার্থ গৌতম চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন ছিলেন। তৎকালীন সময়ে নগরীর অনতিদূরে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী মহাপন্ডিত ঋষি কালদেবল বাস করছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের কুল পুরোহিত। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন- জগতের ভাবীবুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের পর ঋষি কালদেবল আমন্ত্রণ পেয়ে প্রাসাদে আসেন। তিনি নবজন্মজাত সিদ্ধার্থকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। সংসার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য রাজা শুদ্ধোদন সমগোত্রীয় এক অনুপম সুন্দরী নারীর সাথে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের পত্নীর নাম ছিল গোপা বা যশোধরা। বিবাহের পর সিদ্ধার্থ কিছুদিন সংসারে আবদ্ধ ছিলেন। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নিমিত্ত-দর্শন, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্ব লাভ, মহাপরিনির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংসারের দুঃখ-কষ্ট যাতে চোখে না পড়ে সেদিকে তাঁর পিতা খুব সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু তারপরও রাজকুমার সিদ্ধার্থ চার নিমিত্ত দর্শন করলেন। কুমার সিদ্ধার্থের চার নিমিত্ত দর্শন হল– ক্ষীণকায়, দুর্বল, শীর্ণ দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তির দর্শন; রাস্তার ধারে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শন; শবদেহ দর্শন; সন্ন্যাস দর্শন; রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনের পরিবর্তনের জন্য এই চার নিমিত্ত দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার নিমিত্ত দর্শনের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুর্গতি দেখে তিনি বিচলিত হলেন এবং কিভাবে এসব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়- সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। দুঃখময় এ জগতের কথা চিন্তা করে এর উৎস অন্বেষণের জন্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ অধীর হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করল। একে উদীয়মান বিবেকরূপ চন্দ্রকে গ্রাসের নিমিত্ত ভেবে তিনি পুত্রের নাম দিলেন রাহুল। রাহুলের জন্মের পর তিনি নিজেকে আর সংসার জীবনে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন না। তিনি গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন অর্থাৎ সিদ্ধার্থ নামের সার্থকতা অর্জনই হল রাজকুমার সিদ্ধার্থের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সে (৫৯৪ খ্রিঃপূঃ) এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথির গভীর রাতে চিরকালের জন্য সংসার ত্যাগ করে সত্যান্বেষণে বের হয়ে পড়লেন। অপরিসীম রাজ্যসুখ, অনুপম সুন্দরী স্ত্রী, স্নেহময় সন্তান- কোন কিছুই তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারলনা।

প্রথমে তিনি বৈশালী নগরীতে গিয়ে তীর্থিক, জটিল, মুন্ড, নির্গন্থ প্রমুখ নানা সম্প্রদায়ের পন্ডিতদের সাথে পরিচিত হন। তৎকালীন সুবিখ্যাত মুনি ও ঋষি আরাড় কালাম ও রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেও তিনি মুক্তি-পথ সন্ধান করেন। কিন্তু কারও কাছ থেকে জগৎ দুঃখের রহস্য উদ্‌ঘাটনের সন্ধান পেলেন না। এ সময় তিনি শ্রাবস্তী হয়ে রাজগৃহে এলে মগধরাজ বিম্বিসারের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। পরে গয়ার নিকটে তিনি কঠোর কৃচ্ছসাধনে প্রবৃত্ত হন। নির্জন জঙ্গলে তৎকালীন পদ্ধতি অনুসারে উপবাসাদি প্রভৃতি কঠোর সংযম অবলম্বন পূর্বক তিনি তপস্যা করতে লাগলেন। এ সময় পাঁচজন সন্ন্যাসী তাঁর অনুগামী হয়ে তাঁর সাথে তপস্যায় যোগ দেন। কিন্তু এতেও কোন ফল হলনা। তাঁর শরীরই শুধু ধ্বংস হতে লাগল- কোনো অগ্রগতি হলোনা। এভাবে ছয় বছর অতিবাহিত হতে দেখে তিনি বুঝলেন- আলোচনা দ্বারা যেমন কিছু ফল লাভ হয়নি, কৃচ্ছসাধনের দ্বারাও তেমন কিছু ফল লাভ হবে না। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম সাধনার মধ্যম পন্থা গ্রহণ করে গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক গ্রামে চলে আসেন। কৃচ্ছতা ত্যাগ করতে দেখে তাঁর পঞ্চ অনুগামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থবৃক্ষতলে পুনরায় গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন– যতদিন পর্যন্ত সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না- ততদিন পর্যন্ত তিনি এ ধ্যানাসন পরিত্যাগ করবেন না। এভাবে একাগ্রচিত্তে তিনি দিনের পর দিন গভীর থেকে গভীরতর ধ্যান করে যেতে লাগলেন। অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর শ্রেষ্ঠী কন্যা সুজাতা পায়াসান্ন দিয়ে তাঁর সেবা করেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে (৫৮৮ খ্রিঃপূঃ) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রে তিনি বোধি বা পরম জ্ঞান লাভ করেন। বিশ্বের সকল রহস্য তাঁর নিকট উন্মোচিত হলো। সমুদয় তৃষ্ণা ক্ষয় করে আনন্দময় নির্বাণের অধিকারী হলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। বুদ্ধত্ব বা সম্যক জ্ঞান লাভ করে তিনি জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রচার করার মনস্থ করলেন। তৎকালীন ভারতের মানুষ যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতি ও বর্ণভেদ, বিভিন্ন অসার মতবাদের শিকার হয়ে এক অন্ধকারময় জীবনযাপন করত। তিনি তাদের এসব মিথ্যাচার ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করার জন্য আহ্বান করলেন। ধর্মপ্রচারে তিনি যুক্তি তর্ক ও বিচার ব্যতীত কোনো প্রকার ভয়ভীতি ও অলৌকিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তিনি বলতেন জহুরীর স্বর্ণ পরীক্ষণের ন্যায় যে কেউ তার ধর্মোপদেশ যাচাই করে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। ভিক্ষাপাত্র হাতে নগ্নপদে ও পদব্রজে জনগণের মঙ্গল ও উপকারার্থে মহামতি গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদে অবিশ্রান্তভাবে ভ্রমণ করে স্বীয় ধর্মপ্রচার করেছেন। এভাবে দীর্ঘ প্রায় চার যুগ ধর্মপ্রচার করার পর আশি বছর বয়সে ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে আর্যসত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, নির্বাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানব জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি- এটা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। জীবনে দুঃখের এ সম্যক উপলব্ধিতে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হয়েছে। মহামতি গৌতম বুদ্ধ তাই উপলব্ধি করেছিলেন 'সব্বং দুক্খময়ং' অর্থাৎ সবকিছু দুঃখময়। দুঃখ আট প্রকার: যথা- জন্ম, ব্যাধি, বার্ধক্য, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ, প্রিয় বিয়োগ, ইপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি ও পঞ্চ উপাদান- স্কন্ধ দুঃখ। প্রথম সাতটি দুঃখকে প্রবতি দুঃখ এবং অষ্টম দুঃখকে ক্ষণিক দুঃখ বলা হয়। চার আর্যসত্যের মধ্যেই বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূলকথা নিহিত। তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে চতুরার্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা। আবার দুঃখ মুক্তিমার্গের অনুশীলনের দিক থেকে বিচার করলে চতুরার্য সত্য হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূল কথা। বুদ্ধের ধর্ম ও চার আর্যসত্য উভয়ের মূল বা সারকথা হচ্ছে কার্যকারণ নীতি বা শৃঙ্খলা। দুঃখকেই প্রথম ও প্রধান সত্য বলা হয়েছে। জগতে দুঃখ অপেক্ষা বড় কোন সত্য নেই। এ দুঃখের কারণ বা হেতু আছে। হেতু ব্যতীত কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। দুঃখের হেতু বা কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য। এই হেতু বা কারণজাত দুঃখের নিবৃত্তি আছে– এটা তৃতীয় আর্যসত্য। ভগবান বুদ্ধ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করেছেন। এটা হচ্ছে চতুর্থ আর্যসত্য। আট অঙ্গ সমন্বিত দুঃখ মুক্তির পথ হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। বৌদ্ধ দর্শনে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি। ভগবান বুদ্ধের আবিষ্কৃত চার আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ-এ দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদের মাধ্যমেই বুদ্ধ জীবন ও জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং দুঃখ উৎপত্তির জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের আধার বা আশ্রয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ মতবাদের উপর ভগবান বুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং 'ধর্ম' নামে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কেউ যদি তাঁর উপদেশের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তবে প্রথমেই তাঁকে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বুঝতে হবে। এ মতবাদকে তিনি একটি সোপান শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের চরম ও পরম লক্ষ্য হল নির্বাণ। বৌদ্ধ ধর্মে মানব জীবনের চরম মুক্তি বা দুঃখের অন্তিম নিরোধ অর্থে নির্বাণের কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে। তাই নির্বাণ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। কেউ কেউ নির্বাণ বলতে জীবনের বিনাশকে বুঝে থাকেন। বাসনা বা তৃষ্ণার জন্যই মানুষ সংসারে বার বার আসে। নির্বাণ লাভে বাসনা ও জীবনের অবসান ঘটে। তাঁরা প্রদীপ নিভে যাওয়ার সাথে নির্বাণের তুলনা করে বলেন, তেলকে আশ্রয় করে প্রদীপ জ্বলতে থাকে এবং তেলহীন হলে প্রদীপ যেমন নিভে যায়- সেরূপ বাসনারূপ আশ্রয়ের অভাবে জীবনের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু তা সত্য নয়; কারণ ভগবান বুদ্ধ

জীবিতাবস্থায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন। নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যা সর্ব উপাধি বর্জিত ও সর্ব সংস্কার বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকার মালিন্য একে স্পর্শ করতে পারেনা। ধম্মপদে বলা হয়েছে-

আরোগ্যপরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং,
বিস্সাসং পরমং ঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং

অর্থাৎ ''আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধর্ম, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।'' ধম্মপদে আরো বলা হয়েছে- ''মানুষের দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু আছে এবং মানুষের কল্পনায় যা সম্ভব তার মধ্যে নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের কল্পনায় এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারেনা।'' নির্বাণ এক অমৃত পদ যা পরম শান্তিপ্রদ এবং পরম সুখকর। এটা অদুঃখ, অজর, অমর ও অব্যাধি সমন্বিত চিত্তের এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থা যা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান- এই পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করতে পারলেই অনুভূত হয়। প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান সম্পর্কে সার সংক্ষেপ এবং নিজস্ব মতামত উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সিদ্ধার্থ গৌতম জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পুত্রধন, ধন-দৌলত, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন। তিনি সারনাথে সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট যে ধর্ম দেশনা করেন তা 'ধম্মচক্কপবত্তন সুত্ত' বা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে অভিহিত। তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের উপদেশ দেন, ''ভোগবিলাস যেমন ব্যক্তিজীবন পরিশুদ্ধির অন্তরায়, তেমন অতিরিক্ত কৃচ্ছ সাধনাও মহাজীবনের পরিপন্থী।'' এ দুয়ের অন্তসাধনের মধ্যম পন্থা হচ্ছে 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। এ আটটি অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপই শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা; জন্ম-মৃত্যু নিবৃত্তির একমাত্র পথ। আর্যসত্যই হচ্ছে মূল যার অভ্যন্তরে বুদ্ধবাণীর অন্তঃসার নিহিত। মহামতি বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত সর্বজনীন উপদেশ এ ত্রিবিদ্যার মধ্যেই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব অর্থাৎ কার্য-কারণ নীতি, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও নির্বাণ এর সমন্বয় ঘটেছে। মহাকারুণিক বুদ্ধের এ বাণীর প্রতিফলন হলেই বিমুক্তি-সুখ অর্থাৎ নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

wm×v_ †MŠZ‡gi Rb¥-cwiPq

fwgKv

নির্দিষ্ট কোন ভূখন্ডের নাম স্বদেশ। সভ্যতার আলোকে মানুষ পথ চলতে যে রাজনৈতিক চেতনা প্রবাহে তার আপন অস্তিত্বের মূল্যায়ন করে স্বদেশের সার্বভৌমত্ব তাকেই চিহ্নিত করে স্বদেশ বলে। এর মাটি মায়ের মতো, বাতাস প্রাণের দোসর, জল তার সুখ-দুঃখের এপিঠ-ওপিঠ। মানুষ প্রয়োজনে তার ঐতিহ্য রক্ষাকল্পে ব্যক্তির নামানুসারে অথবা ভূখন্ডের যে কোন প্রধান গুণ বিশেষণকে চিরঞ্জীব রাখার জন্য একটি নাম রাখে। তেমনি ভারতবর্ষ একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের নাম। ভারত-ভূমি পৃথিবীর তীর্থভূমি, পুণ্যভূমি, ভারতবর্ষ আবহমান কাল থেকেই ধর্মের লীলা নিকেতন বলেই প্রসিদ্ধ। এ ভারতবর্ষের বৈরাগ্যে উদার গাম্ভীর্য ও নিষ্ঠার কঠোর সংযম আজও ভক্তির অনুরাগে পুঞ্জীভূত হয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে আছে তীর্থ মন্দিরে মন্দিরে।

ভারতের[১] কোলে ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান কপিলাবস্তু। জনশ্রুতি আছে এই তীর্থ নিয়ে। কোন এক সময় কুশীনগর থেকে কুমায়ূন পর্যন্ত ভূভাগ শাক্যজাতির অধীনে ছিল। কথিত আছে যে, সৎমায়ের নির্মম অত্যাচারে অন্ধ্র প্রদেশের পৌরাণিক ইক্ষ্বাকু বংশের কতিপয় রাজকুমার পরবাসী হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে জনৈক কপিল ঋষির সাধন স্থলে এসে উপস্থিত হয় এবং এ অঞ্চলে বসতির পত্তন করে। কালক্রমে কপিল ঋষির নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম হয় "কপিলাবস্তু।"[২] বিখ্যাত কাব্য 'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা অশ্বঘোষ বলেন, "স্বভাব-সুন্দর কপিলাবস্তু নগর এককালে ঋষির সাধন-ক্ষেত্র ছিল, সেজন্যই নগরটির নাম কপিলাবস্তু হয়েছে।" একই অর্থবহ কিন্তু উচ্চারণে কিছুটা ভিন্ন। এরকম আরো কয়েকটি নামে এই নগর পরিচিত। যথা–

ক. কপিলাবস্তু

খ. কপিলপুর

গ. কপিলনগর

নেপালের দক্ষিণ ভাগে বর্তমান গোরক্ষপুরের সন্নিকটে কপিলাবস্তু নামে এক নগর ছিল। একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হিমগিরির পদ-প্রান্ত হতে উৎপন্ন হয়ে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পথ অতিক্রম পূর্বক নগরের পাদদেশ বিধোত করে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে বহে যেত। এই নদীর প্রাচীন নাম রোহিনী, বর্তমানে কোহানা নামে প্রসিদ্ধ। কপিলাবস্তু একটি ক্ষুদ্র পার্বতীয় রাজ্যের রাজধানী। কপিলাবস্তু নামে এই নগরটির প্রকৃত

অবস্থান-স্থল কোথায় এখন পর্যন্ত তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ অস্পষ্ট। বৌদ্ধ গ্রন্থে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের পিতৃভূমি হিসেবেই ভারতের কপিলাবস্তু চিহ্নিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি কেবল যে অস্পষ্ট তাই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী যুক্তির মধ্যে বৈচিত্র্যগত ঐক্য আনয়নের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রদেশের উত্তরে হিমগিরি শ্রেণী তরঙ্গকারে বিরাজিত। পূর্বে পরম বিক্রমশালী মগধ রাজ ও লিচ্ছবিদের রাজত্ব ছিল। আবার হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে কপিলাবস্তু অবস্থিত এবং কোশল রাজ্যের অন্তর্গত বলে অনেক গ্রন্থকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। রাজা বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে কোনো এক সময় বুদ্ধ নিজে বলেছিলেন- "হে রাজন হিমবন্তের কাছে কোশলবাসী ঐশ্বর্য ও পরাক্রম সম্পন্ন এক জাতি আছে, তারা আদিত্য গোত্রীয় এবং শাক্যজাতি।[৩] ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে আমি সেই কূল হতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছি" (দীর্ঘ নিকায় সূত্র)। শাক্যরা যে কোশল রাজ্যের অধীন ছিল উপরিউক্ত কথায় সেটাই প্রমাণ হয়।

কপিলাবস্তু নগর[৪] প্রাচীনকালে যেখানে অবস্থিত ছিল বর্তমানে সেই স্থান 'ভুইলা' নামে খ্যাত। এ কথা ১৮৭৫ সালে কার্লাইস মহোদয় প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কার্লাইস মহোদয় 'ভুইলা' গ্রামের অনতিদূরে একটা জলাশয় এবং একটা নদী আছে বলে উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ পুস্তকাদির চৈনিক অনুবাদে এই নদীর নাম 'ভগীর' অথবা ভগীরথী বা গঙ্গা নামে উল্লেখ আছে। শাক্য ও কোলীয় রাজত্বের মধ্য দিয়ে রোহিনী নামে একটি নদীর পরিচয় সিংহলী ও বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। হয়ত সেই কারণেই বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে শাক্যরাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তু নগর, রোহিনী নামক পার্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] কোন কোন পন্ডিত কপিলাবস্তুকে বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত বলে মনে করেন। অনেকে আবার সীমান্ত প্রদেশের বস্তী জেলার উত্তরাংশের পিপরাওয়া'র সঙ্গে তরাই'র মিল আবিষ্কার করতে তৎপর। মূলত পিপরাওয়ার সন্নিকটে নেপালের তরাই বিভাগের তলাউড়া কোর্ট কপিলাবস্তু নামে চিহ্নিত হয়েছে। পর্যটক হিউয়েন সাঙ যে স্থানকে কপিলাবস্তু বলে উল্লেখ করেছেন তার সাথে এর অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনেক পন্ডিত শাক্যজাতির আবাসভূমি হিসেবে প্রাচীন 'সাকেত' নগরের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রামায়ণে কোশলের রাজধানী অযোধ্যা। মূলত সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর গুরু উপগুপ্তের সঙ্গে বৌদ্ধ তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং লুম্বিনী উদ্যান দর্শন করে যে শিলালিপি রেখে যান তা থেকেই গৌতমের জন্মস্থান অনুমান করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্প্রতি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা অনুসারে অশোক-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায় কপিলাবস্তুর বাস্তুভূমি নেপালের নিকটবর্তী বলে নির্ণীত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে গ্রামগুলোকে এক একটা ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বলা যেতে পারে।[৬] কপিলাবস্তু রাজ্যের আয়তন তেমন বড় ছিল না। অধিবাসীরা সংখ্যায় দশ লক্ষের বেশি ছিল না কিন্তু সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের যেন সীমা ছিল না। সে সময়ে কপিলাবস্তুর রাজা তেমন শক্তিমান ভূপতি ছিলেন না। স্বগোত্রদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলেই শুদ্ধোদনকে তারা তাদের রাজা নির্বাচন করেছিল। শাক্যরা যে প্রদেশ অধিকার করে বাস করত তার মধ্যে কপিলাবস্তু, শিলাবতী, সক্কর, দেবদহ প্রভৃতি অনেকগুলো সমৃদ্ধ নগরীর উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায়-শাক্যবংশীয় গৌতমের পিতার রাজধানী বলে কপিলাবস্তু বৌদ্ধগ্রন্থে গৌরবোজ্জ্বল নগরীরূপে কীর্তিত হলেও অধিকাংশ গ্রন্থে কখনোই কপিলাবস্তু সমৃদ্ধশালী নগরীরূপে চিহ্নিত করা হয়নি।

জাতকট্ঠকথা মতে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় কোশল সম্রাট বিড়ূঢ়ভের নেতৃত্বে শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তু ধ্বংস হয়। কারণ, শাক্যরা রাজকুমারীর নামে বিড়ূঢ়ভের পিতা কোশলরাজ প্রসেনজিতের সঙ্গে মহানাম শাক্যের ওরসে এক দাসী কন্যার বিবাহ দেন। এই নির্লজ্জ প্রতারণার প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে বিড়ূঢ়ভ শাক্যদের রাজধানী ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিড়ূঢ়ভ সিংহাসনে উপবেশন করে প্রতিহিংসায় শাক্যদের সমূলে শেষ করার উদ্দেশ্যে যখন মহাযাত্রা শুরু করেন তখন গৌতম বুদ্ধ জাতির এই চরম মুহূর্তে রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় একটা পত্রপল্লবহীন গাছের নীচে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা এই সংবাদ পেয়ে উক্ত গাছের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। রাজসৈন্যরা রাজার আদেশের অপেক্ষায় পশ্চাতে দন্ডায়মান। রাজা বিড়ূঢ়ভ গৌতম বুদ্ধকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, "ভগবান আপনি এই চরম মুহূর্তে কেন এই পত্রহীন গাছের নিচে আসন নিয়েছেন?" গৌতম বুদ্ধ সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন যে, "আমি জ্ঞাতিদিগের ছায়ায় সুশীতল"।

gnvgvqv †'exi ¯c 'k‡b wm×v‡_i gvZMfaviY

"শ্বেতপদ্ম শুন্ডে ধারণ করে
এক জ্যোতির্ময় শ্বেতহস্তী
তাঁর গর্ভে প্রবেশ করছে।"[৭]

কপিলাবস্তু নগরে তখন আষাঢ়-উৎসব চলছিল। আকাশে আষাঢ়-নক্ষত্র। নাগরিকগণ উৎসবে মত্ত। মহারানী মহামায়া দেবী পূর্ণিমার সপ্তাহকাল পূর্ব থেকেই মাদকজাত দ্রব্যাদি ভোজনে বিরত থেকে বিবিধ সুগন্ধমাল্য ও বিচিত্র বিভূতিসম্পন্ন সেই রাজকীয় উৎসব উপভোগ করতে করতে সপ্তম দিবসের প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে সুবাসিত জলধারায় অবগাহনান্তে চার লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মহাদান যজ্ঞের আয়োজন করলেন এবং সর্বালংকারে বিভূষিতা হয়ে উত্তম ভোজন গ্রহণ করলেন।

অতঃপর দেবী মহামায়া উপোসথব্রত অধিষ্ঠানপূর্বক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পালংকোপরি নিদ্রিত হলেন। নিদ্রাবস্থায় দেবী রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন–

চারজন দিক্‌পাল মহারাজ পালংকসহ দেবীকে ভূমি হতে উত্তোলন করে হিমালয়ের ষাট যোজন বিস্তৃত মনোসিল তলে সপ্তযোজন উচ্চ এক মহাশাল বৃক্ষের অধোভাগে স্থাপন করে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তখন তাঁদের মহিষীগণ এসে দেবীকে পরিশুদ্ধ করতে অনবতপ্ত হ্রদে নিয়ে গেলেন। ঐ হ্রদে স্নান করিয়ে দিব্য বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, সুগন্ধদ্রব্যাদি দিয়ে দেবীকে সমলংকৃত করলেন। এর অনতিদূরে একটি রজতপর্বত শোভা পাচ্ছিল যার প্রকোষ্ঠে ছিল একটি সুরম্য কনক প্রাসাদ। সেই কনক প্রাসাদে দেবীকে পূর্বশীর্ষ এক দিব্যশয্যায় শয়ন করালেন। তখন এক দিব্য শ্বেতহস্তী (বোধিসত্ত্ব) অদূরে এক স্বর্ণময় পর্বতে বিচরণ করতে করতে উত্তর দিক হতে ঐ রাজপর্বতে আরোহণ করলেন। তারপর প্রতীয়মান হল যেন এটা রজত শুভ্র শুন্ডে একটি শ্বেতপদ্ম গ্রহণ করে মহাবৃংহণনাদে কনক প্রাসাদে প্রবেশ করে দেবীর শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে দেবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করলেন। এভাবে উত্তরাষার নক্ষত্র পূর্ণিমা তিথিতে বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন।[৮]

মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের পূর্বে বোধিসত্ত্ব তুষিত স্বর্গে ছিলেন। তখন তিনি পাঁচটি মহাবলোকন[৯] করেছিলেন– কোন্ সময়ে, কোন্ দ্বীপে, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে এবং কোন্ জননীর গর্ভে তিনি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি মহাবলোকনের দ্বারা স্থির করেছিলেন। মহাবলোকনগুলো নিম্নরূপ:

i) যখন মনুষ্যলোকে শতবর্ষ আয়ু হয় তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।

ii) পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ- অতএব জম্বুদ্বীপে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন।

iii) জম্বুদ্বীপের মধ্যে আবার মধ্যদেশ শ্রেষ্ঠ যেখানে কোশল রাজ্য এবং কপিলাবস্তু নগর আছে। অতএব তিনি মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করবেন।

iv) তখন পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল শ্রেষ্ঠ, অতএব তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করবেন।

v) জননী সম্বন্ধে তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন– বুদ্ধমাতা কখনও লোভী ও সুরাসক্ত হন না। তিনি লক্ষ কল্প কালাবধি পুণ্য-পারমিতা পূর্ণ করেন এবং জন্মাবধি অখন্ডভাবে পঞ্চশীল[১০] রক্ষা করেন।

cÂkxj wb¤i¡c

i) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

ii) অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

iii) কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

iv) মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

v) সুরামেরেয় মজ্জপমদটঠ্না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।[১১]

কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদনের মহিষী মহামায়া দেবী এরূপ সর্বগুণ সম্পন্না মহাপুণ্যবতী রমণী। অতএব তিনি বুদ্ধজননী হবেন। কপিলাবস্তুর শাক্যকুলাধিপতি রাজা শুদ্ধোদন সর্বগুণোপেত মাতৃশুদ্ধ পিতৃশুদ্ধ পুণ্যতেজ তেজস্বী চক্রবর্তী বংশ-সমুদ্ভুত অপরিমিত ধন নিধিরত্ন- সমন্বাগত অভিরূপ দর্শনীয় ধর্মজ্ঞ ধর্মরাজ এবং প্রজানুরঞ্জক ছিলেন। তিনিই বুদ্ধ-জনক হবার উপযুক্ত।

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দশ সহস্র চক্রবাল[১২] এক সঙ্গেই প্রচন্ড শব্দে কম্পিত হয়ে উঠল। বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত[১৩] প্রকাশ পেল। পরের দিন প্রাতঃকালে সুপ্তোত্থিতা দেবী সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করলেন। তখন রাজা চৌষট্টি জন খ্যাতিমান বেদজ্ঞ জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে লাজপত্র-পুষ্প বিদীর্ণ হরিদ্বর্ণ ভূমিতে সুরচিত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণ ও রৌপ্যময় পাত্রপূর্ণ ঘৃত, মধু, শর্করা- মিশ্রিত পায়সান্ন, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আবরণ দিয়ে আবৃত করে দান দিলেন। এছাড়া নববস্ত্র এবং পিঙ্গলবর্ণ গাভী দানাদি দিয়েও তাঁদেরকে পরিতৃপ্ত করলেন। এভাবে পরিতৃপ্ত করে ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞেস করলেন– "স্বপ্নের ফল কি হবে?"[১৪] ব্রাহ্মণগণ গণনা করে বললেন– "মহারাজা, চিন্তা করবেন না। আপনার মহিষী সন্তান সম্ভবা হয়েছেন। সে সন্তান পুত্র, কন্যা নয়। যদি এই পুত্র গৃহবাস করে তাহলে চক্রবর্তী রাজা হবেন আর যদি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করে তাহলে জগতে সর্বাসক্তিমুক্ত বুদ্ধ হবেন।"[১৫] ব্রাহ্মণগণের ভবিষ্যদ্বানী শুনে রাজার চিত্ত মহানন্দে পরিপূর্ণ হল। কিন্তু পরক্ষণেই অজানা আশংকায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন– যদি পুত্র গৃহত্যাগ করে তাহলে এই রাজ্যভার কে গ্রহণ করবে? কিন্তু পরে চিন্তা করলেন মানুষ মাত্রই কর্মের অধীন। ভবিষ্যতে যা হওয়ার তাই হবে। তিনি মহামায়া দেবীর সর্বপ্রকার সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হলে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর মাতার যাতে কোন মনুষ্য বা অমনুষ্য অনিষ্ট সাধন করতে না পারে সেজন্য চার দেবপুত্র অদৃশ্য থেকে সশস্ত্র প্রহারায় নিযুক্ত হলেন। বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হলে তাঁর মাতা কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। এগুলো নিম্নরূপ-

i) বোধিসত্ত্বের মাতা কোন পুরুষের প্রতি প্রমাদবশত অনুরক্ত হননা এবং তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হন।

ii) তিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-রূপ সুখের অধিকারিণী হন এবং ঐ সুখের উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তুর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত হয়ে বিহার করেন।

iii) তিনি কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হননা। তিনি সুস্থ, সবল এবং অনবসন্ন দেহেই থাকেন।

iv) তিনি তাঁর কুক্ষির অভ্যন্তরে অবস্থিত বোধিসত্ত্বকে সর্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সর্বেন্দ্রিয়-সম্পন্ন দেখতে পান এটাও বোধিসত্ত্ব-জননীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

gvZMf †_‡K wm×v_ †M‡Z‡gi Awfbe Rb¨

মহামায়া দেবী দশ মাস কাল গর্ভ রক্ষা করে পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তাঁর পিত্রালয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে রাজা শুদ্ধোদনকে নিবেদন করলেন -"দেব, আমার দেবদহ নগরে পিত্রালয়ে যাওয়ার সাধ হয়েছে।"[১৬] রাজা সাধুবাদের সাথে দেবীকে অনুমতি দিলেন এবং কপিলাবস্তু নগর হতে দেবদহ নগর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাঘাট সমতল করিয়ে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ কলস ও ধ্বজা-পতাকাদি দিয়ে রাজপথ সুসজ্জিত করালেন। অতঃপর দেবীকে সুবর্ণময় শিবিকায় বসিয়ে সহস্র সহচরী ও অমাত্যগণ পরিবেষ্টিতাবস্থায় শোভাযাত্রা সহকারে দেবদহের পথে পাঠালেন।[১৭]

দেবদহ নগর ও কপিলাবস্তুর মধ্যভাগে একটি উদ্যান ছিল যার নাম লুম্বিনী।[১৮] এই উদ্যান উভয় নগরবাসীর অধীনে ছিল। এখানে একটি মঙ্গল শালবন বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, মায়াদেবীর পিতামহী রানী লুম্বিনীর নামানুসারে 'লুম্বিনী' উদ্যান প্রসিদ্ধ। পিত্রালয়ে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যানের অপরূপ শোভা দেখে মায়াদেবী ঐ শালবনে প্রমোদ ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে সহচরী ও অমাত্যগণ দেবীকে সেই শালবনে প্রবেশ করালেন। লুম্বিনীর শালবন তখন অপরূপ সাজে সজ্জিত। সদ্য প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পের মনোরম শোভায় বৃক্ষরাজি সুশোভিত। বিহঙ্গকুলের মধুর কুজনে চতুর্দিক মুখরিত। মায়াদেবী সুবর্ণপালঙ্ক থেকে নেমে একটি মহাশালবৃক্ষের সামনে চলতে লাগলেন।

দেবীর ইচ্ছা হল তিনি ঐ শালবৃক্ষের একটি শাখা ধরে দাঁড়াবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি শাখা বেতসলতার ন্যায় নুয়ে এসে দেবীর হাতের পাশে এসে ধরা দিল। যখন প্রসারিত কোমল হাতে দেবী ঐ শাখা ধরে দন্ডায়মান হলেন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রসব বেদনা উৎপন্ন হলো। তখন রানীর চতুর্দিকে যবনিকা-বেষ্টনী দিয়ে অনুচরবৃন্দ একটু তফাতে সরে দাঁড়াল। বৃক্ষশাখা ধারণ করে দন্ডায়মান অবস্থাতেই দেবী বোধিসত্ত্বকে প্রসব করলেন। দেবীর দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করে বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হলেন। সেদিন ছিল শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিনি (খ্রীঃপূঃ ৬২৪ অথবা ৪৬৩ অব্দ)। কথিত আছে, ভূমিষ্ট হয়ে তিনি সপ্তপদ উত্তরদিকে অগ্রসর হন এবং প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের নীচে একটি করে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

গর্ভ থেকে নির্গত হবার পর কালক্রমে তাঁর এমন শোভা হলো, মনে হলো তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন; কারণ তিনি অযোনিজাত। তিনি বহুকল্প পূর্বে আত্মাকে সংস্কৃত করেছিলেন বলে জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন- মূঢ় হয়ে নয়।[১৯] দীপ্তি হলেও ধৈর্যে তিনি ছিলেন মাটির বুকে বালসূর্যের মতো। অত্যন্ত দীপ্ত হলেও তাঁর দিকে তাকালে মনে হতো তিনি চাঁদের মতোই নয়ন ভোলানো। মহামূল্য কাঞ্চনের মতো সুন্দর বর্ণের দীপ্তিতে তিনি সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করেছিলেন। তিনি সপ্তর্ষি নক্ষত্র সদৃশ ছিলেন, তাই সপ্তপদ গমন করেছিলেন- ঐ পদক্ষেপগুলো শান্ত, ঋজু, উন্নত, দৃঢ় এবং ধীর ছিল। সিংহগতি সম্পন্ন সেই বালক চারদিকে দৃষ্টিপাত করে শুভ এবং সার্থক বানী উচ্চারণ করলেন, "বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সংসারে এই আমার শেষ জন্ম।"[২০] আকাশ থেকে চন্দ্রকিরণের মতো শুভ্র দুটি শীতল ও উষ্ণ বারিধারা তাঁর প্রশান্ত মস্তকে বর্ষিত হলো। তিনি সুন্দর চন্দ্রাতপমন্ডিত শয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই শয্যার স্তম্ভ বৈদুর্যমণিখচিত এবং স্বর্ণোজ্জ্বল; তাঁর গৌরব স্বর্ণকমল হাতে যক্ষাধিপতিগণ চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেবগণ অদৃশ্য থেকে তাঁর প্রভাবে নতশিরে শুভ্র ছত্র ধারণ করেছিলেন, আর তাঁর বোধি লাভের জন্য পরম আশীর্বাদ উচ্চারণ করেছিলেন। বৃহদাকার সর্পগুলো অতীত বুদ্ধগণের সেবার অধিকার পেয়েছিলেন। বিশেষ ধর্মে তৃষ্ণায় তাঁকে বীজন করেছিলেন এবং ভক্তিপূত নয়নে তাঁর উপর বর্ষণ করেছিলেন মন্দার পুষ্প! পবিত্র চিত্ত ও শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ তথাগতের জন্মের পুণ্যে আনন্দিত হলেন– আসক্তিহীন হয়েও দুঃখমগ্ন জগতের কল্যাণের কথা ভেবেই তাঁরা প্রসন্ন হয়েছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হিমালয়লগ্ন পৃথিবী বায়ুতাড়িত তরণীর মতো কেঁপে উঠল, মেঘহীন আকাশ থেকে নীলপদ্ম ও চন্দনমিশ্রিত বর্ষণ শুরু হলো। দিব্য বস্ত্ররাশি বর্ষণ করতে করতে সুখস্পর্শ মধুর বাতাস প্রবাহিত হতে লাগল। সূর্যই যেন বেশ অধিকতর দীপ্তি নিয়ে প্রকাশিত হলো, অগ্নিবীণা প্রেরণায় জ্বলে উঠলো প্রশান্ত শিখায়! আবাসগৃহের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি কূপ আবির্ভূত হলো,

স্বচ্ছ ও নির্মল জল তার! অন্তঃপুরের অধিবাসীগণ বিস্মিত হলেন; তীর্থ মনে করে সেই জলেই তাঁরা ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান করলেন। তাঁকে দর্শন করতে এলেন ধর্মার্থিগণ, স্বর্গস্থ দেবতারা!। এঁদের আগমনে বন পূর্ণ হলো। কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তাঁরা বৃক্ষ থেকে অকালেও পুষ্পবর্ষণ করলেন। অশান্ত প্রাণীরা হিংসা ত্যাগ করল, স্বজাতি বা অপর কাউকে পীড়িত করল না; পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত রোগ বিনা চেষ্টায় প্রশমিত হলো। পশুপাখিরা মধুর ধ্বনি করল, নদীগুলো শান্ত সলিল নিয়ে প্রবাহিত হলো, বিভিন্ন দিক প্রসন্ন হলো, নির্মল ও নির্মেঘ আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল।

লোকের মুক্তির জন্য লোকগুরু জন্মগ্রহণ করলেন; নীতিবান প্রভুকে লাভ করেই অস্থির জগৎ শান্ত হলো। সংসারে একমাত্র কামদেব প্রসন্ন হলেন না। তাঁর দিব্য ও অদ্ভুত জন্ম দর্শন করে স্বভাবত ধীর হলেও রাজা অত্যন্ত বিচলিত হলেন। স্নেহবশত ভয় ও আনন্দজনিত দুটি অশ্রুধারা তিনি মোচন করলেন। মাতার মন স্বভাবতই স্নেহসিক্ত। তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে মহিষী প্রীত হলেন, আবার ভীতও হলেন; যেন শীতল ও উষ্ণ জলের একটি মিশ্রিত ধারা। অত্যন্ত বৃদ্ধা রমণীগণ ভয়ের হেতুই দেখেছিলেন, তাঁরা অনুসন্ধান করতে পারেন নি। তাঁরা পবিত্র হয়ে মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান করলেন, শিশুর জন্য দেবসংঘের কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলেন।

মনিরত্ন যেমন কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হলে একে অন্যকে কলুষিত করে না– কারণ উভয়েই শুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, মাতৃকুক্ষি হতে নিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বও সুনির্মল, শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক। জল, শ্লেষ্মা, রুধি অথবা অন্য কোন প্রকার অশুচিতে তিনি লিপ্ত নন। সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদোপরি দন্ডায়মান এবং উত্তরাভিমুখী হয়ে সপ্তপদে গমন করেন, মস্তকোপরি মহা-ব্রহ্মা শ্বেতচ্ছত্র, সুযাম দেবপুত্র প্রকান্ড বিজনী ও অন্যান্য দেবগণ বহুবিধ দিব্যপাত্র হাতে তাঁকে অনুসরণ করলেন। প্রতিসন্ধিক্ষণের ন্যায় তাঁর জন্মক্ষণেও বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

যেই মুহূর্তে বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী রাহুলমাতা (যশোধারা), সারথি ছন্ন (ছন্দক), হস্তীরাজ আজানীয়, অশ্বরাজ কন্থক, অমাত্য কালোদায়ী, রাজকুমার আনন্দ[২১] জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মহাবোধি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল। তখন চারটি নিধিকুম্ভও (ধনুকুম্ভ) উৎপন্ন হয়েছিল। নিধিকুম্ভসমূহের মধ্যে আয়তনে একটি গব্যুতিপ্রমাণ, একটি অর্ধযোজন প্রমাণ, একটি ত্রিগবুতি প্রমাণ ও একটি যোজন প্রমাণ। এগুলোকে সপ্ত সহজাত বলা হয়েছে। অতঃপর দেবদহ ও কপিলাবস্তু এই উভয়

নগরের অধিবাসীগণ শোভাযাত্রা সহকারে বোধিসত্ত্বকে নিয়ে কপিলাবস্তু নগরে আগমণ করল। পান্ডিত্য, স্বভাব ও বাক্‌পটুতায় বিখ্যাত ব্রাক্ষণগণ নিমিত্তগুলোর কথা শুনে উত্তমরূপে বিচার করলেন, তারপর ভীত ও প্রসন্ন রাজার কাছে এসে প্রফুল্ল, বিস্মিত ও উজ্জ্বল মুখে বললেন- পৃথিবীতে শান্তিকামী যত প্রাণী আছে, তারা একমাত্র পুত্রই কামনা করে, গুণ কামনা করেন না। আপনার এই পুত্র কুলপ্রদীপ। সুতরাং হে রাজন্‌, আজ নৃত্যোৎসবের আয়োজন করুন। চিন্তা ত্যাগ করে শান্তচিত্ত হোন; আনন্দ করুন; আপনার বংশের শ্রীবৃদ্ধি হবে। লোকনেতা আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, পৃথিবীতে যারা দুঃখার্ত; ইনি তাদের রক্ষক। তাঁর দেহ প্রদীপের মতো দীপ্ত, তাঁর অঙ্গ স্বর্ণোজ্জ্বল। ইনি গুণের আধার; ইনি কালে জ্ঞানীদের মধ্যে ঋষিত্ব এবং পরম ঐশ্বর্য লাভ করবেন। যদি ইনি পৃথিবীর সম্পদ ইচ্ছা করেন তবে ন্যায়ের নীতিতে সমগ্র পৃথিবী জয় করে নৃপতিদের মধ্যে বিরাজ করবেন, যেমন সমস্ত গ্রহের মধ্যে সূর্যের প্রকাশ ঘটে। অথবা ইনি যদি মোক্ষ লাভের জন্য গমন করেন তবে ইনি তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত মতবাদ সম্পূর্ণ জয় করে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হবেন; তখন তিনি পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরুর মতোই বিরাজ করবেন। যেমন– ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ পবিত্র, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র এবং অগ্নির মধ্যে সূর্য, তেমনি মানুষের মধ্যে আপনার পুত্র শ্রেষ্ঠ। নিমেষহীন বিশাল, স্নিগ্ধ, দীপ্ত এবং নির্মল তাঁর নয়ন দুটি তেমনি স্থির, কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত এবং পরিচ্ছন্ন রোমযুক্ত। এই নয়নের দৃষ্টিতে ইনি সকল বস্তু দর্শনেই সমর্থ।

wm×v_ †MŠZ‡gi Rb¥¯vb

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশি পূর্বেকার কথা। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের গাঁ ঘেঁষে বয়ে চলেছিল রোহিনী নদী। এরই তীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাজ্যের নাম কপিলাবস্তু। শাক্যরাজগণ এ রাজ্যে রাজত্ব করতেন। সর্বশেষ রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। তিনি পিতা রাজা সিংহহনুর আদেশে এবং মাতা কাত্যায়নীর অনুরোধে পার্শ্ববর্তী দেবদহ রাজ্যের রাজা সুপ্রবুদ্ধের রূপবতী প্রথমা কন্যা মহামায়াকে বিয়ে করেন। তাঁদের ঔরসে[২২] ভারতের উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের, বর্তমান নেপাল রাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তের হিমালয় কোলের কপিলাবস্তু ও দেবদহ নগরের মাঝখানে বুটল জেলার ভগবান তহশীলের রুম্মিনদেই স্থানে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর লুম্বিনী স্থানটি লুম্বিনী নামেই বহু বাংলা ও ইংরেজী পুস্তকে উল্লেখ থাকলেও স্থানীয় ভাষায় লুম্বনী বলা হয়ে থাকে। ধন্য শালতরু শোভিত রমণীয় লুম্বিনী যেখানে সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। লুম্বিনীর আনন্দ কাননে রাজপুত্র গৌতমের জন্ম হল[২৩] (মতান্তরে ৫৬৪ বা ৬২০ খ্রিঃপূঃ)। বর্তমানে এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, সিদ্ধার্থের জন্ম হয় খ্রিঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে।

wm×v_ †MŠZ‡gi bvgKiY

জন্মের পর রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে নবজাতকের নামকরণ এবং শুভাশুভ নির্ধারণের জন্য পন্ডিতদের ডাকা হলো। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের নামকরণের জন্য বোধিসত্ত্বের জন্মের পঞ্চম দিবসে একশত আটজন ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁদের মধ্যে আটজন ছিলেন দৈবজ্ঞ এবং তৎকালে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। তাঁরা হলেন- রামদ্বিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কোন্ডণ্য, লক্ষণ, সুযাম, সুদান্ত এবং ভোজ। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণ দিবসেও মায়াদেবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁদের মাধ্যমেই বিচার করা হয়েছিল। তাঁর শিশুর নামকরণ করলেন "সিদ্ধার্থ"। রাজকুমারের জন্মের পর রাজ্যের সকলেরই অর্থসিদ্ধি হয়েছিল বলে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখলেন "সব্বার্থ সিদ্ধ"[২৪] বা "সিদ্ধার্থ"।

মহামায়া দেবী পুত্র প্রসবের মাত্র সাতদিনের মধ্যে স্বর্গালোকে যাত্রা করলেন। চন্দন কাঠের স্তূপ আর ঘৃত স্নানে পিচ্ছলিত পবিত্র শরীর ভস্মীভূত হল চিতার দহনে। উর্ধ্বমুখী ধোঁয়ার রেখাপাত ধরে মহামায়া পরলোকে পাড়ি দিলেন। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে- সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তম দিনে মহামায়া স্বর্গারোহণ করে তুষিত স্বর্গে ছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধত্ব লাভের পর এক আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিথিতে সিদ্ধার্থ তুষিত স্বর্গে জননীকে আর্যসত্যের সন্ধান দিতে গমন করেছিলেন। পুনরায় তিন মাস পরে নেমে আসেন মাটির পৃথিবীতে আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে। রাজ-অন্তঃপুর জন কোলাহলে মুখরিত অথচ সকলেই অক্ষম এই নতুন শিশুর ক্রন্দন রোধ করতে। এমন সময় বিমাতা গৌতমী এই নব কুমারের লালন পালনের সমস্ত দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে রাজা শুদ্ধোদনকে আশ্বস্ত করলেন। বিমাতা গৌতমীর কোলে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়তে থাকল এই নবকুমার। তুষিত লোকাবতীর্ণ বোধিসত্ত্বের পুনরায় নাম হল গৌতম। এজন্য তিনি সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও অভিহিত হন। মায়ের মৃত্যুর পর বিমাতা ও মাসী মহাপ্রজাপতি গোতমীর হাতে প্রতিপালিত বলে তার আর এক নাম গৌতম। শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় তিনি শাক্যসিংহ নামেও অভিহিত হন।

"বাড়িল কুমার বিমাতার লালন-পালনে
দেবী অংশে গৌতমী নামেতে রাণী
অতি ভাগ্যবতী
স্তন পান করাইল দুর্লভ নন্দনে।"[২৫]

আবার কেউ কেউ মনে করেন, রাজকুমার গৌতম[২৬] গোত্রজ, এ জন্যেই উত্তরকালে গৌতম নামে তিনি পরিচিত হন। কিন্তু অনেকের ধারণা-মা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নামানুসারে নব কুমারের নাম রাখা হয় গৌতম।

gnvgvqvi gZ¨

জন্মের সাতদিন পর মাতা মহামায়ার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। মহামায়া তার ছোট বোন মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে তার কাছে ডাকলেন, গৌতমী মহারাণীর সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। মহামায়া সে সময় পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে কপালে চুম্বন এঁকে দিলেন। কিন্তু একি তার ঠোঁট কেঁপে উঠছে কেন? গৌতমী বললেন, দিদি। আপনি এরকম করছেন কেন? আপনার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব? শুদ্ধোদনের মত যার স্বামী, সিদ্ধার্থের মত যার পুত্র তার কিসের অভাব? মহাপ্রজাপতি গৌতমী কি বুঝতে পেরেছিলেন মহামায়ার মৃত্যু আসন্ন। মহামায়া আস্তে আস্তে পুত্রকে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর হাতে তুলে দিলেন এবং বললেন- বোন আজ হতে এ সন্তান তোমার; স্নেহে, যত্নে, একে মানুষ করার দায়িত্ব তোমার। একথা বলার পর মহামায়া নীরব হলেন। মহাপ্রজাপতি অশ্রুসজল নয়নে সম্মতি জানালেন আর সাথে সাথেই মহামায়া মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী মহামায়ার স্থান দখল করলেন। তিনি স্নেহে, আদরে, সেবায়, যত্নে, সিদ্ধার্থকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় সিদ্ধার্থ দিনে দিনে বেড়ে উঠলেন। হেসে খেলে আনন্দ উল্লাসে মনোরম পরিবেশে কেটে গেল সিদ্ধার্থের শৈশবের দিনগুলো। মাতৃহারা পুত্রকে ছেড়ে মহাপ্রজাপতি গৌতমী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যেতেন না।

Dhaka University Institutional Repository

wm×v_ †MŠZ‡gi Rb¨KÛjx

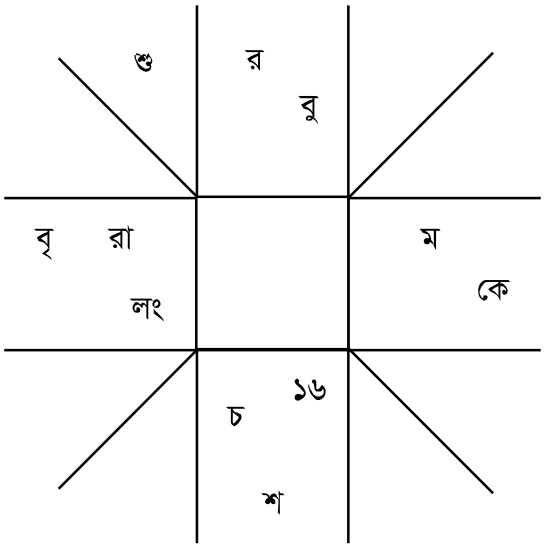

Fwl Kvj‡'e‡ji fwel¨Øvbx

"কপিলাবস্তু নগরে মহারাজ শুদ্ধোদনের ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে"- ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকের দেবগণ এই বলে সমুৎফুল্ল হৃদয়ে তরঙ্গাকুল দিব্য উত্তরীয় উড়িয়ে ক্রীড়ামোদে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

সে সময় নগরীর অনতিদূরে মহাপন্ডিত এবং জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ঋষি কালদেবল বাস করছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের কুল পুরোহিত। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন জগতের ভাবীবুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন শুদ্ধোদনের ঔরসে মহামায়ার গর্ভে। মহারাজ শুদ্ধোদনের কুলপুরোহিত অষ্টসমাপত্তি লাভী কালদেবল ঋষি দ্বিপ্রহরের ভোজনকৃত সমাপনান্তে দিবাবিহারের উদ্দেশ্যে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গিয়ে উৎসবমত্ত দেবগণকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন-

"কি কারণে তোমরা এত হৃষ্টচিত্তে আমোদ-আহ্লাদ করছ? আমাকে অনুগ্রহপূর্বক এটার কারণ ব্যক্ত কর।" দেবগণ কারণ ব্যক্ত করলে মহর্ষি তৎক্ষণাৎ দেবলোক হতে অবতরণ-পূর্বক কপিলাবস্তুতে রাজা শুদ্ধোদনের প্রাসাদে প্রবেশ করে দ্বারপালের মুখে মহর্ষির আগমণ বার্তা শুনে রাজা শুদ্ধোদন মহর্ষিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন-"আপনার আগমণের কারণ জানতে পারলে খুশি হব। আপনার যদি কোন বস্ত্র বা খাদ্যের অভাব হয়ে থাকে বলুন, আমি আপনার প্রয়োজন মিটাতে চেষ্টা করব।"

মহর্ষি বললেন - "মহারাজ, আপনি নাকি একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অন্তঃপুর হতে পুত্রকে নিয়ে এসে পুত্রের মস্তক ঋষির পায়ে ঠেকাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুত্রের পদযুগল ঋষির মস্তকের দিকে সরে গেল। রাজা তিনবার চেষ্টা করলেন, তিনবারই বিফল হলেন। তখন ঋষি রাজাকে বললেন- "মহারাজ, এই শিশুর মস্তক আমার পায়ে ঠেকাতে চেষ্টা করবেননা। আমিই শিশুর পদযুগল আমার মস্তকে স্থাপন কর্‌ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বের পদযুগল ঋষির জটার উপর প্রতিষ্ঠিত হল। ঋষি আনন্দাশ্রু সংবরণ করে উত্তরীয়কে একাংশগত করে দক্ষিণ জানু ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে সাদরে বোধিসত্ত্বকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করলেন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলেন। রাজা এরকম অদ্ভূত ঘটনা দেখে নিজেও পুত্রকে বন্দনা করলেন।

ঋষি দেবল অতীতের চল্লিশ কল্প এবং ভবিষ্যতের চল্লিশ কল্প- এই আশি কল্পের কথা স্মরণ করতে পারতেন। তিনি বোধিসত্ত্বের শরীরে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ দেখে চিন্তা করলেন ''নিঃসংশয়ে ইনি বুদ্ধ হবেন, আশ্চর্য পুরুষ এই শিশু''- এটা ভেবে তিনি পরমানন্দে, মৃদু হাসলেন। তারপর তিনি অনুধাবন করলেন-এই শিশু যখন বুদ্ধ হবেন তখন তিনি পৃথিবীতে থাকবেন না। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বুদ্ধদর্শন হবেনা। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবেনা। তার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে অরূপ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হবেন। ঋষির এই জন্মে বুদ্ধদর্শন হবেনা জেনে দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করলেন। ঋষির এই ভাবান্তর দেখে রাজা শুদ্ধোদন ভয় বিহবল অন্তরে করজোড়ে নতজানু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ''একি ঋষি প্রবর! কেন এই রোদন? কেন এই দীর্ঘশ্বাস? প্রভু! কি দেখলেন, শিশুর কোন অমঙ্গল? বলুন দয়া করে।" তৎপর ঋষিপ্রবর অশ্রু ধারা মুছে উত্তর দিলেন- ''মহারাজ! যিনি জগতের মঙ্গল নিদান, তাঁর অমঙ্গল কি করে সম্ভব হয়? আমি শিশুর জন্য কাঁদছিনা, কাঁদছি আমার নিজের জন্য। যেহেতু এই শিশু একদিন দেব-মানবের হিতের জন্য জগতে মহান ধর্ম সাধন করে বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হবেন এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মুত্যুর অবসানের পথ সুগম করে নির্বাণ ধর্ম প্রচার করবেন।''[২৭]

ঋষি আরও বললেন- রাজকুমারের কোন বিপদ হবেনা, তিনি অসাধারণ পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়ে বহুজনের হিত ও সুখের জন্য ধর্মচক্র প্রবর্তন করবেন। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, আমার জীবনের দীপশিখা অচিরেই নিভে যাবে। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করতে পারবনা। তাই দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করছি।

রাজা ঋষিকে অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিলেন, কিন্তু ঋষি সমস্তই বোধিসত্ত্বকে প্রদান করলেন। অতঃপর ঋষি রাজার সঙ্গে কিছুক্ষণ বার্তালাপ করলেন, যার সারমর্ম হল- এই শিশুর শরীরে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণ[২৮] আছে এবং অশীতি প্রকার অন্যান্য লক্ষণ (অনুব্যঞ্জন)[২৯] আছে। অতএব নিঃসংশয়ে তিনি বুদ্ধ হবেন এবং ধর্ম প্রচার করে জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে পূজিত হবেন।"

অতঃপর মহর্ষি স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেউ তাঁকে বুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবে কিনা অবলোকন করে ভাগিনেয় নালককে দেখতে পেলেন। তখনই তিনি রাজ-প্রসাদ হতে ভগ্নীগৃহে পদার্পণ করে সহোদরাকে জিজ্ঞেস করলেন-

"ভগিনি, পুত্র নালক কোথায়?"

"দাদা, সে গৃহেই আছে।"

"তাকে ডাকো।"

ভাগিনেয় নালক সামনে উপস্থিত হলে ঋষি তাকে বললেন "রাজা শুদ্ধোদনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি বুদ্ধাঙ্কুর এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়ঃকালে তিনি অবশ্যই বুদ্ধ হবেন। তুমি তাঁর দর্শন লাভ করবে। অতএব এখনই গৃহত্যাগ করে ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।

নালক ভাবলেন, তাঁর মাতুলবাক্য কখনও মিথ্যা হতে পারেনা এবং তিনি সপ্ত অশীতি কোটি ধনসম্পদশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ঋষিবাক্য শ্রবণ করে ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্বক হিমালয়ে চলে গেলেন। পরবর্তীকালে তপস্বী নালক পরম সম্বোধিপ্রাপ্ত তথাগত বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের মুখে 'নালক প্রতিপদা"[৩০] নামক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে পুনরায় হিমালয়ে প্রবেশ করে অর্হত্বফল লাভ করেছিলেন। অর্হত্বফল লাভের সাত মাস পরে তিনি এক সুবর্ণ পর্বতশীর্ষে দন্ডায়মান অবস্থাতেই অনুপধিশেষ পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন।

evþY †R¨wZlx‡'i fwel¨Øvbx

মহারাজ শুদ্ধোদন বোধিসত্ত্বের জন্মের পঞ্চম দিবসে একশত আটজন ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। রাজভবনে তাঁদেরকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করে কুমারের ভবিষ্যৎ কি হবে তা বিচার করতে বললেন। বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধিগ্রহণ দিবসেও মায়াদেবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তাঁদের মাধ্যমেই বিচার করা হয়েছিল। তাঁরা শিশুর নামকরণ করলেন "সিদ্ধার্থ"। কিন্তু শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুটি ব্যাখ্যা

দিলেন। সাতজন দুটি আঙ্গুল উত্তোলন করে বললেন- যদি কুমার সংসারী হন তাহলে চক্রবর্তী রাজা হবেন। আর যদি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন তাহলে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ কোন্ডণ্য নামক ব্রাহ্মণ কেবল একটি আঙ্গুল উত্তোলন করে বললেন ''এই কুমার সংসার ধর্মে আবদ্ধ হবেন এটার কোন হেতুই আমি দেখছিনা। ইনি নিঃসংশয়ে আসক্তি শূন্য বুদ্ধ হবেন।'' কুমারের সংসার ত্যাগের সম্ভাবনা আছে শুনে রাজা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞেস করলেন- ''কি দর্শন করে আমার পুত্র সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে?'' ব্রাহ্মণগণ বললেন- চার প্রকার পূর্বনিমিত্ত। যথাঃ

i) জরাজীর্ণ পুরুষ

ii) ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি

iii) মনুষ্যের মৃতদেহ

iv) সন্ন্যাসী

এই কথা শুনে রাজা অমাত্য সকল কর্মচারীদের সম্বোধন করে বললেন- ''অদ্য হতে এরূপ নিমিত্তসমূহ যেন আমার পুত্রের সম্মুখে পড়তে না পারে। বুদ্ধ হয়ে আমার পুত্রের লাভ নেই। আমার পুত্র সংসারী হয়ে রাজচক্রবর্তী হোক।'' তিনি আরও আদেশ করলেন- ''চতুর্দিকে ষোলো যোজন দূরত্বের মধ্যে যেন কোন জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, মনুষ্যের মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী দেখতে না পায়।''

অতঃপর সেই জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তাঁদের পুত্রগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- ''বৎসগণ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। মহারাজ শুদ্ধোদন পুত্রের সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইহলোকে জীবিত থাকবেন কিনা সন্দেহ। সেই কুমার সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হলে তোমরা তাঁর ধর্মে প্রব্রজা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করবে।''[৩১]

বোধিসত্ত্বের নামকরণ দিবসে রাজা শুদ্ধোদনের অশীতি সহস্র জ্ঞাতিবৃন্দ রাজপ্রসাদে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে এক একটি পুত্র সন্তান দান করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, ''ইনি বুদ্ধই হোন বা চক্রবর্তী রাজাই হোন আমরা প্রত্যেকে তাঁকে এক একটি পুত্র দান করব। যদি ইনি বুদ্ধ হোন, আমাদের পুত্রগণ বুদ্ধ পরিবৃত হয়ে বিচরণ করবেন। আর যদি চক্রবর্তী রাজা হোন ক্ষত্রিয়-কুমার পরিবৃত হয়ে বিচরণ করবেন। যে কোনটাতেই আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে, শাক্যবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।''

wm×v_ †MŠZ‡gi ev j¨Rxeb

বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর মাতা মায়াদেবী ইহলোক ত্যাগ করে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তখন পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মহিষী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর উপরই ন্যস্ত করে বত্রিশ জন বিশেষ পরিচারিকা নিযুক্ত করেছিলেন।[৩২] বোধিসত্ত্ব মহান শ্রী সৌভাগ্যের মধ্যে বর্ধিত হতে লাগলেন। মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্বীয় স্তন দান করে আত্মজবৎ বোধিসত্ত্বকে লালন-পালন করতে লাগলেন।

সেকালের প্রসিদ্ধ ঋষি অসিত[৩৩] হিমালয়ের এক গুহায় বাস করতেন। তিনি রাজকুমারের জন্ম সংবাদ পেয়ে কপিলাবস্তুতে উপস্থিত হলেন। শুদ্ধোদন সন্তানের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায় শিশুটিকে তপস্বীর চরণ ধূলো দিতে অনুরোধ করলেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষি অসিত কী এক লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলেন, ইনি সেই বুদ্ধ যার জন্য ভারতের নিমজ্জিত মনুষ্যত্ব দন্ডায়মান। তাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দুই হাত জোড় করে তুলে নিলেন কুমারের চরণ দুখানি নিজের মাথায়, কৃতার্থ হল প্রভুর দর্শনে। সন্ন্যাসী রাজার কোল থেকে নিজ কোলে নিয়ে বললেন- ''আপনার এই পুত্রের দেহে রয়েছে মহাপুরুষের দুর্লভ লক্ষণ।''

কালে কালে ক্রোড়ের শিশু নেমে এল মাটির বুকে। রাজ-অন্তঃপুরের মসৃণ পাথর-খোদাই এর মেঝের উপর হামাগুড়ি দেয় চঞ্চল শিশু। ভেঙ্গে ফেলে সৌখিন আসবাব। প্রসাধন কক্ষের আয়নার তাক থেকে নামিয়ে আনে মৃত মায়ের সিঁদুরের কৌটা। সারা গায়ে মাখে লাল আবির। অন্য ঘর থেকে ছুটে আসেন গৌতমী। শরীরের সিঁদুর মুছিয়ে কোলে তুলে নেন। ফুলদানীর সজীব ফুল শুকিয়ে গেলে কাঁদে। গৌতম যখন হাঁটতে শিখল, তখন একদিন উদ্যানের মধ্যে একাকী একটি প্রজাপতির ছিন্ন ডানা দেখে চিৎকার করে উঠেছিল।

তৎকালীন সময়ে দৈহিক শক্তি আর মানসিক দৃঢ়তায় ক্ষত্রিয়দের ভারত সাম্রাজ্যের সামন্ত প্রভুর মর্যাদা দান করেছিল। কেউ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করলে তাকে কেবল ব্রাহ্মণ নামেই অভিহিত করা হতো। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ব্যক্তির দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দিকটা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই পক্ষের জন্য ছিল একই ধরনের। এই দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দিকটা হচ্ছে প্রচলিত আর্য সমাজের[৩৪] উপনয়ন প্রথা। সেটা হচ্ছে সামাজিক সংস্কার এবং দ্বিজত্ব প্রাপ্তির একটা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর্য সমাজে সন্তানের নবম বর্ষ বয়স হলে উপনয়ন সমাপন করে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে প্রবিষ্ট করানো হতো। ব্রহ্মচর্য পালন অর্থ দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পথ নির্মাণ করা। আর

দ্বিজত্ব প্রাপ্তির অর্থ বৈদিক কর্মে অধিকার, মুক্ত বাতাসে গুরুগৃহে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত হওয়া। চিরায়ত প্রথা অনুযায়ী যুবরাজের উপনয়ন হওয়ার পর অর্থাৎ সিদ্ধার্থ গৌতমের যখন আট বছর বয়স তখন তাঁর পিতা শুদ্ধোদন অমাত্যগণকে বললেন- সিদ্ধার্থকে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম এমন একজন উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান কর। অমাত্যগণ বিশ্বমিত্র[৩৫] পন্ডিতের কথা বললে রাজা বিশ্বমিত্রের কাছে সংবাদ পাঠালেন- ''বিশ্বমিত্র কি কুমার সিদ্ধার্থের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক?'' বিশ্বমিত্র সম্মতি জানালেন।

বিশ্বমিত্রের সম্মতি জেনে রাজা জ্যোতিষীদের মাধ্যমে একটি শুভদিন স্থির করে বয়োবৃদ্ধ শাক্যদের সঙ্গে নানাবিধ শুভকর্মের অনুষ্ঠান পালন করে রাজকুমারকে গুরুগৃহে প্রেরণ করলেন। সঙ্গে আরও পাঁচশত শাক্য কুমারদের পাঠালেন।[৩৬] বিদ্যালয়ে উপনীত হলে বিশ্বমিত্র ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের অপরিমিত শ্রী ও তেজ সহ্য করতে না পেরে অধোমুখে ভূমিতে নিপতিত হলেন। তখন শুদ্ধবর[৩৭] নামক তুষিতকায়িক দেবতা বিশ্বমিত্রকে ভূমি থেকে উত্তোলন করে বললেন- ''এই কুমার সর্বসূত্রশাস্ত্রে পারদর্শী ও অন্যান্যদেরও তা শিক্ষা দিতে সক্ষম।'' দিব্যপুষ্প বোধিসত্ত্বের চতুর্দিকে বর্ষণ করলেন।

কুমার সিদ্ধার্থ উরগসার-চন্দনময় লিপিফলক, উৎকৃষ্ট মসী (লেখার কালি) এবং রত্ন খোচিত সোনার কলম গ্রহণপূর্বক উপাধ্যায়কে বলেন ''ভো উপাধ্যায়, আপনি আমাকে কোন্ লিপি শিক্ষা দিবেন?'' এই বলে তিনি তাঁর জ্ঞাত ৬৪ প্রকার লিপির কথা উপাধ্যায়কে বললেন। তিনি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধ লিপি, মঙ্গল্যলিপি, মনুষ্য লিপি, অঙ্গুলীয় লিপি, শকারি লিপি, ব্রহ্মবল্লী লিপি, দ্রাবিড় লিপি, কিনারী লিপি, দক্ষিণ লিপি, উগ্র লিপি, সংখ্যা লিপি, অনুলোম লিপি, অর্দ্ধধনু লিপি, দরদ লিপি, খাস্য লিপি, চীন লিপি, লূন লিপি, হূন লিপি, মধ্যাক্ষর বিস্তর লিপি, পুষ্প লিপি, দেব লিপি, নাগ লিপি, যক্ষ লিপি, গন্ধর্ব লিপি, কিন্নর লিপি, মহোরগ লিপি, অসুর লিপি, গরুড় লিপি, মৃগ লিপি, চক্রলিপি, মরুলিপি, ভৌমদেব লিপি, উত্তরকুরুদ্বীপ লিপি, অপর গোদানি লিপি, পূর্ব বিদেহ লিপি, উৎক্ষেপ লিপি, নিক্ষেপ লিপি, বিক্ষেপ লিপি, প্রক্ষেপ লিপি, সাগর লিপি, বজ্র লিপি, লেখ প্রতি লেখ লিপি, অনুদ্রুত লিপি, শাস্ত্রাবর্ত্ত লিপি, গণনাবর্ত্ত লিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্ত লিপি, নিক্ষেপাবর্ত্ত লিপি, পাদলিখিত লিপি, (দিরুত্তর পদসন্ধি লিপি হতে দশোত্তর পদসন্ধি লিপি পর্যন্ত), অধ্যহারিনী লিপি, সর্বরুতসংগ্রহণী লিপি, বিদ্যানুলোমা লিপি, বিমিশ্রিত লিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণীপ্রেক্ষিণী লিপি, গগণপ্রেক্ষিণী

লিপি, সবৌষধিনিষ্যন্দা, সর্বসার-সংগৃহণীও সর্বভূতরুত গ্রহণী, এই ৬৪ প্রকার লিপি অবগত আছেন এবং ৪৬টি অক্ষরও* তাঁর জানা আছে। অক্ষরগুলো নিম্নরূপঃ

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ।

ক খ গ ঘ ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ।

কুমারের মুখে ৬৪ প্রকার লিপির কথা শুনে বিশ্বমিত্র বিস্ময়াভিভূত হয়ে বললেন- ''কুমার সর্বশাস্ত্র অবগত আছেন। তিনি যে লিপিসমূহের কথা উল্লেখ করলেন আমি তো সেগুলোর নামও জানিনা।''[৩৮]

শিক্ষক বিশ্বমিত্রের কাছে কুমারের শিক্ষণীয় কিছু নেই জেনে রাজা শুদ্ধোদন কুমারের জন্য এমন শিক্ষকের সন্ধান করলেন যাঁরা কুমারকে সেনাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতে সক্ষম। অমাত্যগণ সুপ্রবুদ্ধের পুত্র ক্ষান্তদেবের নাম প্রস্তাব করলে কুমারকে ক্ষান্তদেবের কাছে পাঠানো হলো। কুমার ক্ষান্তদেবকে বললেন- ''মহাশয়, আমার সকল বিদ্যা জানা আছে। আপনি বরং পাঁচশত শাক্য যুবকদের সেনাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিন।''[৩৯] যিনি দেব মানবের শিক্ষার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন; তিনি এই সাধারণ গুরুর কাছে কি শিক্ষা গ্রহণ করবেন? কুমার অতি সহসা গুরুকে অতিক্রম করে সর্বশাস্ত্রে সুদক্ষ হয়ে উঠলেন। যেন পূর্বে সর্ববিদ্যা তাঁর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল।

কুমার শৈশব কাল থেকেই বিবেক প্রিয় ছিলেন। এই বিবেক প্রিয়তা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করল। তিনি রাজকীয় ভোগ বিলাসের প্রতি সর্বদা উদাসীন। নীরবে নির্জনে থাকতে ভালবাসেন। যখনি একা থাকার সুযোগ পেতেন তখনই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। কি চিন্তা করতেন তা একমাত্র তিনি নিজেই জানতেন।

একদিন কুমার পুষ্পোদ্যানে বসে ধ্যানস্থ হলেন। এমন সময়ে শুভ্র মেঘখন্ডের ন্যায় শত শত রাজহংস আকাশ পথ দিয়ে পরমানন্দে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজহংস তাঁর সম্মুখে অর্ধমৃতাবস্থায় পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। সিদ্ধার্থ হংসটিকে হাতে নিয়ে দেখলেন, শরাঘাতে হংসটি আহত। তিনি আস্তে আস্তে শরটি তুলে হংসটিকে সুস্থ করলেন। হংসটি অশ্রুপূর্ণ নয়নে সিদ্ধার্থের মুখপানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সিদ্ধার্থ হংসটির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। এমন সময় তাঁর মামাতো ভাই দেবদত্ত এসে

বলল- ''এ হংসটি আমার শরে হত। সুতরাং আমার হংস আমাকে দাও।'' সিদ্ধার্থ বললেন- যে জীবনদাতা, পাখিটি তার প্রাপ্য? না, যে জীবন হরণকারী, পাখিটি তার প্রাপ্য? দেবদত্ত নীরব রইলেন। দয়ায় বিগলিত সিদ্ধার্থ বললেন- ''দেবদত্ত, হংসটি হত নয়, আহত মাত্র। শরটি তুলে দিয়ে আমি তার প্রাণরক্ষা করেছি। ভাই দেবদত্ত, তোমারও প্রাণ আছে, তুমি কি পরের দুঃখ বুঝনা? তুমি এ হংসটির পরিবর্তে আমার শাক্যরাজ্য নিতে পারো, তথাপি প্রাণ থাকতে হংসটি দেবোনা।''

সিদ্ধার্থ করুণা বিগলিত কণ্ঠে দেবদত্তকে যা বলেছিলেন তা কবি নবীন চন্দ্র সেনের ভাষায় বলা যায়-

আঘাতের ব্যাথা ভাই আজি বুঝিয়াছি আমি
হংসের ব্যাথা প্রাণ হয়েছে বিকল,
তোমার তো আছে প্রাণ পাখিটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ নাকি কি যে ব্যাথা পেয়েছে ভীষণ।

শরবিদ্ধ পাখিটি নিয়ে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল তা রাজা শুদ্ধোদন পর্যন্ত গড়ায়। রাজা সিদ্ধার্থের যুক্তি অখন্ডনীয় বিধায় তার পক্ষে রায় দেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ পাখিটি প্রাসাদে নিয়ে আসে এবং শুশ্রূষা করে উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেন।

প্রতিনিয়ত যে মহৎপ্রাণ মানুষের জন্য কেঁদেছে, সে যে কেবল চিরকালের দুঃখ হৃদয়ে সঞ্চয় করে মর্তালোকে ভূমিষ্ট হবে এতে আর বিচিত্র কি! মূলত শত ব্যথিতের বেদনার সাথে একাকার হয়ে যে প্রাণ কাঁদে,[৪০] সে যে কেবলই মানুষ তা তো নয়, সে তো মানুষেরই দেবতা, সে তো চির পূজনীয়। রাজকীয় ঐশ্বর্যের ভিতর লালিত পালিত হয়েও সিদ্ধার্থ শৈশব থেকেই গভীর চিন্তাশীল ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন।

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস করতেন, কোন বিলাসিতা জীবনের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আঘাত হানতে পারে। কপিলাবস্তু নগরে প্রতিবছর হলকর্ষণ- উৎসব হতো। এই দিন রাজ্যের রাজা, অমাত্যগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সকলে নিজের হাতে হাল চালনা করতেন। একবার কিশোর সিদ্ধার্থ এই হলকর্ষণ উৎসবে যোগ দেন। এই উৎসবে এসে তিনি প্রথম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন জগত-সংসারের নিষ্ঠুরতা ও হিংসার বীভৎস রূপ। তিনি দেখলেন, উদরান্ন সংগ্রহের জন্য ঘর্মাক্ত কলেবর কৃষকের কঠোর সংগ্রাম, হালবাহী ক্লান্ত বলদের উপর নির্মম বেত্রাঘাত। তিনি আরো দেখলেন, হলকর্ষণে ভেজা মাটি থেকে বের হয়ে পড়েছে অনেক পোকা-মাকড়।

বড় পোকাগুলো ছোট ছোট পোকাগুলোকে খাচ্ছে, একটি ব্যাঙ এসে বড় পোকাগুলো ধরে খাচ্ছে। এরপর তিনি আরো দেখলেন, কোথা থেকে একটি সাপ বের হয়ে আস্ত ব্যাঙটিকে ধরে গিলতে আরম্ভ করে। পরক্ষণে একটি চিল আকাশ থেকে উড়ে এসে ছোঁ মেরে সাপটিকে তুলে নিয়ে যায়। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থ জনসমাবেশ থেকে বের হয়ে নির্জন স্থানে একটি বৃক্ষতলে এসে বসলেন। তিনি সেখানে গভীর ভাবনায় ধ্যানমগ্ন হলেন। অন্যদিকে রাজা শুদ্ধোদন দীর্ঘক্ষণ কুমারকে না দেখতে পেয়ে বিচলিত হলেন। চতুর্দিকে রাজার অনুচরেরা কুমার সিদ্ধার্থকে সন্ধান করতে লাগল। অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেল সামান্য কিছু দূরে এক জম্বুবৃক্ষের নিচে, নির্জন পরিবেশে ধ্যানমগ্ন চিত্তে একাকী বসে আছেন। ক্লাইভ বেইল তার সভ্যতা পুস্তকে (অনুবাদ গ্রন্থ) উল্লেখ করেছেন যে, ''যে যত প্রকৃতির কাছাকাছি গেছে সে তত বেশী আত্মস্থ হয়েছে।'' তাহলে কুমার সিদ্ধার্থ অতি শৈশবেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে নিজের সুপ্ত চৈতন্যকে আবিষ্কার করেছিলেন। হলকর্ষণ উৎসবের দিন কুমার গাছের নিচে বসেছিলেন ললিত বিস্তরে[৪১] তার উল্লেখ পাওয়া যায়- ''তোমরা কি দেখেছ শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থ অচল, অটল ও ধ্যানস্থ হয়ে এখানে বসে আছেন। ক্রমশ সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত হচ্ছে এবং আকাশের হরিৎ বরণ গোধূলি শোভা সিদ্ধার্থের মুখাবয়বে প্রকাশিত হচ্ছে। পরম শুভ লক্ষণ ছড়ানো এর শরীরে, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এত বেলা হয়েছে অথচ কী আশ্চর্য! বৃক্ষের ছায়া এখনও তার শরীর পরিত্যাগ করে দূরে সরে যায়নি। ছায়ার মত সাথে সাথে রয়েছে।''

কিশোর সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পন করলেন কিন্তু জন্মলব্ধ অনুভূতি ক্রমশই তাঁকে নিরুদ্দেশের পথে ডাকছে। সিদ্ধার্থ কোন্ পথ বেছে নেবেন কঠিন এক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হলেন-আত্মীয় স্বজন, রক্তের সম্বন্ধ নাকি তিতিক্ষা,[৪২] প্রেম, মৈত্রী, করুণা। রাজা শুদ্ধোদন কঠিন সংকটে নিমজ্জিত হয়েছেন, তাঁর কেবলই থেকে থেকে মনে পড়ছে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন কখনই যুবরাজকে একাকী প্রাসাদের বাইরে যেতে দিতেন না। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত হল প্রমোদ ভবন, সতর্ক প্রহরী নিয়োজিত হল কক্ষের চারদিকে। যুবরাজ যেন কখনোই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে বৈরাগ্যের আহ্বানে সাড়া দিতে না পারে। অপরিসীম শৌর্যবীর্যের অধিকারী হয়েও যুবরাজ সিদ্ধার্থ সঙ্গীদের সাথে খেলতে যাননা, অশ্বের পিঠে চড়ে নগর ভ্রমণেও যেতে চাননা। তিনি অশ্ব, রথ, গজ, অস্ত্র ইত্যাদি চালনায় ক্ষত্রিয়োচিত এবং যুবরাজোচিত পারদর্শী ছিলেন। শাক্য রাজ্যে তার চেয়ে সাহসী ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কেউ ছিলেন না। পক্ষান্তরে নিজের পায়ের আঘাতেই ক্ষুদ্র কীট কিংবা তৃণের পতন হলে অপরাধীর মতো ছুটে

আসেন মায়ের কাছে। তিনি মৃগয়ায় গিয়ে মৃগদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ না করে ছেড়ে দিতেন। সঙ্গীদের সাথে সকল বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ হয়েও নিজে ইচ্ছা করে পরাজিত হয়ে তাদের জিতিয়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন।

যুবরাজ সিদ্ধার্থের যৌবনকাল অপরিসীম বিলাস ও ভোগৈশ্চর্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। পিতা শুদ্ধোদন পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য এবং সংসার জীবনে আবদ্ধ করে রাখার অভিপ্রায়ে তিন ঋতুর উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে প্রদান করেছিলেন: যথা- বর্ষাকালিক, হৈমন্তিক ও গ্রীষ্মকালীন। প্রাসাদগুলোর নাম যথাক্রমে রম্য, সুরম্য ও শুভ। এগুলো আবার একটি নবতল বিশিষ্ট, একটি সপ্ততল বিশিষ্ট এবং অপরটি পঞ্চতল বিশিষ্ট। একদিন রাজা শুদ্ধোদন[৪৩] শাক্যদের সঙ্গে সন্থাগারে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন বর্ষীয়ান শাক্যগণ রাজাকে বললেন- 'মহারাজ, আপনার নিশ্চয়ই নৈমিত্তিক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কথা স্মরণে আছে যাঁরা বলেছিলেন- সিদ্ধার্থ কুমার যদি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন। আর যদি সংসারী হন তাহলে চতুরঙ্গ সেনাসমন্বিত বিজিতবান্ চক্রবর্তী রাজা হবেন, ধার্মিক ধর্মরাজ এবং সপ্তরত্নসমন্বাগত হবেন। চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, পরিনায়করত্ন- এই সপ্তরত্ন তাঁর নিকট প্রাদুর্ভূত হবে। তিনি পরসৈন্যপ্রমর্দক শৌর্যবীর্যশালী বরাঙ্গরূপী সহস্র পুত্রের জনক হবেন। তিনি এই ভূমন্ডলকে বিনা দন্ডে, বিনা শস্ত্রে জয় করে একচ্ছত্রাধিপতিরূপে ধর্মোপায়ে শাসন করবেন। অতএব কুমার যাতে সংসারী হন, মহারাজ তার ব্যবস্থা করুন। কুমার বর্তমানে ষোড়শ বর্ষে পদার্পন করেছে। এটাই বিবাহের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণপরিবৃত থাকলে রতিসুখ অনুভব করবেন, গৃহত্যাগে আর তাঁর প্রবৃত্তি জাগবেনা। এভাবে আমাদের চক্রবর্তিবংশও রক্ষিত হবে।"[৪৪] রাজা বললেন- তাহলে আপনারা কুমারের জন্য উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণ করুন। পাঁচশত শাক্যগণের সকলেই বললেন- আমার কন্যাই উপযুক্ত, আমার কন্যাই সুরূপা। রাজা বললেন- কুমারকে বিবাহের ব্যাপারে কিছু বলা কঠিন। তারপরও আমরা কুমারকে জিজ্ঞেস করি, তার কিরূপ কন্যা পছন্দ। সকলে গিয়ে কুমারকে এই বিষয়ে অবগত করলে কুমার বললেন- সপ্তম দিবসে আপনাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিব।[৪৫]

কুমার সিদ্ধার্থ সপ্তম দিবসে তার পিতাকে বললেন- ''আমি এমনই গুণসম্পন্না ভার্যা ইচ্ছা করি। তিনি সাধারণা নারী হবেন না। রূপে, জন্মে, কুলে এবং গোত্রে তিনি হবেন সুশুদ্ধা। তিনি সুশিক্ষিতাও হবেন। তিনি উত্তম রূপযৌবনধরা হলেও রূপমত্তা হবেন না। মাতা-ভগ্নীর ন্যায় যিনি মৈত্রীচিত্তপরায়ণা হবেন। তিনি হবেন ত্যাগরতা, শ্রমণব্রাহ্মণদের প্রতি দানশীলা হবেন। তাঁর কোন প্রকার মান, অহংকার, শাঠ্য,

ঈর্ষা, ছলনাদি দোষ থাকবেনা। স্বপ্নান্তরেও তিনি পরপুরুষাসক্তা হবেন না। তিনি অপ্রমত্তা হয়ে নিজ পতিরই শয্যাসঙ্গিনী হবেন। তিনি গর্বিতা, উদ্ধতা ও প্রগল্‌ভা হবেন না। পানভোজন, রস, শব্দ, গন্ধে তাঁর কোন লোভ থাকবে না এবং স্বধনে তুষ্ট থাকবেন। তিনি সদা সত্যে স্থিত থাকবেন, চঞ্চলা ও ভ্রান্তা হবেন না। বসনে ভূষণে লজ্জাশীলা হবেন। সর্বদা ধর্মযুক্তা এবং কায়মনোবাক্যে শুদ্ধভাবাপন্ন হবেন। তাঁর মধ্যে তন্দ্রালস্যাদি দোষ থাকবে না। তিনি মানমূঢ়া হবেন না। তিনি মীমাংসাযুক্তা, সুকৃতা ও সদা ধর্মচারিণী হবেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলা হবেন। দাসী-পরিজনবর্গকে নিজের মত ভালবাসবেন। শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকবে। তিনি সকলের পরে শয়ন করবেন এবং সর্বাগ্রে গাত্রোত্থান করবেন। তিনি হবেন মাতৃভক্ত এবং অকৃত্রিম মৈত্রী অনুবর্তিনী।"[৪৬]

কুমার সিদ্ধার্থ এরূপে তাঁর পিতার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের মনের কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন- ''হে মহাব্রাহ্মণ, যাও কপিলাবস্তু নগরে। ব্রাহ্মণী হোক, ক্ষত্রিয়া হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্রী হোক, যার মধ্যে এই সকল গুণ আছে সেই কন্যাকে কুমারের জন্য ব্যবস্থা কর। কুল বা গোত্র সম্বন্ধে আমার পুত্রের কোন আপত্তি নেই। যার মধ্যে গুণ, সত্য এবং ধর্ম আছে সে রকম নারীই কুমারের কাম্য।"[৪৭]

রাজা শুদ্ধোদনের আদেশ স্বরূপ মহাব্রাহ্মণ কপিলাবস্তু নগরে বিচরণ করতে করতে সর্বগুণসম্পন্না দন্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপাদেবীকে দেখতে পেলেন এবং রাজাকে জ্ঞাত করলেন। রাজা চিন্তা করলেন- ''গোপা যদি বাস্তবিকই সর্বগুণসম্পন্না হয়ে থাকেন, তাহলে গোপা নিশ্চয়ই কুমারের পছন্দ হবে। কিন্তু আমি চাই কুমার নিজেই নিজের ভার্যা নির্বাচন করুক।" এজন্য রাজা ঘোষণা করলেন যে, সপ্তাহকাল ব্যাপী রাজ্যের সমস্ত শাক্য কুমারীগণকে অশোক ভান্ডের মনি-কাঞ্চন বিতরণ করা হবে। অনন্তর অশোক-ভান্ড বিতরণ কক্ষ বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত করা হল। শাক্য রাজকুমারীগণ সুসজ্জিত বসন ভুষণে সজ্জিত হয়ে আশোকভান্ডের মনি-কাঞ্চন গ্রহণের নিমিত্ত ধীর মন্থর গতিতে রাজন্তঃপুরে আগমন করতে লাগল। এমন সময় এক দেবীমূর্তি বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিতা হয়ে সলজ্জ মুখমন্ডলে ধীর পদক্ষেপে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হল। কুমার শান্ত, ধীর, দেবমূর্তির প্রতি এক নেত্রে, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। কুমার কুমারীর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। উভয়ে নির্বাক নিস্পন্দ চিত্রের ন্যায় দন্ডায়মান, অনেকক্ষণ পরে গোপা (যশোধরা)[৪৮] কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে উঠলেন- ''যুবরাজ, আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী? আমাকে অশোকভান্ডের কোন উপহার না দিয়ে আপনি বঞ্চিত করলেন? আমি কি আপনার নিকট এতই ঘৃণার

পাত্রী?'' কুমার বললেন- ''না, না, তুমি আমার ঘৃণার পাত্রী নও; আদরের পাত্রী। তবে বর্তমানে আমার অশোক ভান্ড শূন্য হয়ে গিয়েছে। তোমাকে কি উপহার দেব তা ভাবছি।'' অনন্যোপায় হয়ে নিজের হাতের অঙ্গুরী মোচন করে গোপাদেবীর হাতের অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিলেন। গোপাও কুমারের হস্তবরণ শূণ্য দেখে নিজের অঙ্গুরী উন্মোচন করে কুমারকে পরিয়ে দিলেন। তখন রাজন্তঃপুর আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। অর্থাৎ কুমার সিদ্ধার্থ গোপাকেই মনোনীত করলেন। এরপর রাজা শুদ্ধোদন দন্ডপাণি শাক্যকে সংবাদ পাঠালেন। দন্ডপাণি সংবাদ শুনে বললেন, ''আর্য! কুমার সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে সুখে লালিত হয়েছে। আমাদের কুলধর্ম হচ্ছে শিল্পজ্ঞকে কন্যা দান করা, অশিল্পজ্ঞকে নয়। কুমার শিল্পজ্ঞও নয়, অসি-ধনুষ্কলাপ যুদ্ধ বিধিও তার জানা নেই। অতএব আমি কিভাবে অশিল্পজ্ঞকে কন্যা দান করব?'' কুমার সিদ্ধার্থ পিতা শুদ্ধোদনের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বললেন- ''পিতা, আমি মনে করি আমার মত শিল্পজ্ঞ কপিলাবস্তুতে কেউ নেই। আপনি সকল শিল্পজ্ঞকে একত্রিত করুন। আমি আমার শিল্প পরীক্ষা প্রদান করব।'' এই কথা শুনে রাজা কপিলাবস্তু নগরে ঘোষণা করালেন, ''সপ্তম দিবসে কুমার শিল্প প্রদর্শন করবে। সকল শিল্পজ্ঞরা সমবেত হোন।''[৪৯] অতঃপর সপ্তম দিবসে পাঁচশত শাক্যকুমার সমবেত হল। দন্ডপাণি-শাক্যের কন্যা গোপা ''জয়পতাকা'' ভূমিতে প্রোথিত করে ঘোষণা করল- ''অদ্য অসিযুদ্ধ, ধনুষ্কলাপ যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধে যে জয়ী হবে, এই জয়পতাকা তারই প্রাপ্য।''

সর্বপ্রথম দেবদত্ত প্রতিযোগিতার জন্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথিমধ্যে দেখলেন এক অপরূপ রূপলাবন্যসম্পন্ন শ্বেতহস্তী। বৈশালীর লিচ্ছবীগণ তা কুমার সিদ্ধার্থের সম্মানার্থে পাঠিয়েছেন এটা শুনে দেবদত্ত ক্রোধে এবং ঈর্ষায় অগ্নিশর্মা হয়ে মুষ্ট্যাঘাতে এটাকে হত্যা করল। সিদ্ধার্থের অনুজ কুমারনন্দ হস্তীর মৃতদেহ দেখে তা নগরদ্বারের বাইরে নিক্ষেপ করল। ইতিমধ্যে কুমার সিদ্ধার্থ রথারোহণে সেই স্থলে উপস্থিত হলেন। তিনি হস্তীটির বৃত্তান্ত শুনে হস্তীটিকে নগরের বাইরে এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করলেন- কারণ গলিত হস্তীদেহের দুর্গন্ধে সমস্ত নগর দুর্গন্ধময় হয়ে জনসাধারণের অস্বস্তি ও রোগোৎপত্তির কারণ হবে। কথিত আছে যে, হস্তীদেহের নিক্ষিপ্ত স্থানে বিরাট একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, যার নামকরণ হয়েছিল হস্তীগর্ত।[৫০]

সিদ্ধার্থের বাহুবল পরীক্ষা করার জন্য শাক্যরা তাঁকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলেন। একদিকে সিদ্ধার্থ অন্যদিকে পাঁচশত শাক্য কুমার। নন্দ, আনন্দ প্রমুখ শাক্যকুমারগণ সিদ্ধার্থের তেজোবল সহ্য করতে না পেরে ভূপতিত হয়েছিল। শেষে দাম্ভিক দেবদত্ত অগ্রসর হলে সিদ্ধার্থ তার দর্প চূর্ণ করার জন্য দক্ষিণ হস্ত

দিয়ে দেবদত্তকে তিনবার সবেগে ঘুরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করতে চাইলেন। কিন্তু তার প্রতি অনুকম্পাবশত শুধুমাত্র মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর একে একে সকল শাক্যকুমার ভূপতিত হল।

এরপর শাক্য কুমারদের শর নিক্ষেপে নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিতে বলা হলো। শর নিক্ষেপে একে একে সকলে নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শন করলেন। তারপর কুমার সিদ্ধার্থের পরীক্ষা। তিনি বললেন- ''এই নগরে এমন কোন ধনু কি নেই যাতে আমি জ্যা আরোপন করতে পারি? রাজা বললেন- ''হাঁ পুত্র, তোমার পিতামহ সিংহহনুর ধনু আছে। অদ্যাবধি কেউ ঐ ধনুতে জ্যা আরোপন করতে পারেনি।'' কুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''মহারাজ, সেই ধনু আনয়ন করা হোক।'' ধনু আনয়ন করা হলে শাক্য কুমারদের অনেকে তাতে জ্যা আরোপণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে সিদ্ধার্থ অনায়াসে তাতে জ্যা আরোপণ করা মাত্রই সমগ্র কপিলাবস্তু নগর সেই জ্যা আরোপণ শব্দে মুখরিত হল। তারপর কুমার শর নিক্ষেপ করলেন। সেই শর লৌহময় সপ্ত তালবৃক্ষ যন্ত্রযুক্তবরাহ প্রতিমা ও দশক্রোশস্থ লৌহময়ী ভেরী ছিন্ন করে ধরণীতলে প্রবিষ্ট হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে কুমারের শর প্রবিষ্ট হয়েছিল সেখানে একটি গভীর কূপ সৃষ্টি হয়েছিল বলে কিংবদন্তী আছে। ঐ স্থানের নাম হয়েছিল শরকূপ। যার বর্তমান নাম হল শর-কুইয়া।[৫১]

কুমার সিদ্ধার্থের জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হল। শাক্যগণ বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন- ''কি আশ্চর্য! কি অদ্ভূত শিল্প কৌশল! তাঁর সমকক্ষ যোগ্য শাক্যদের মধ্যে কেউ নেই।'' আকাশে দৈববাণী শ্রুত হল-

"এষ ধরণিমন্ডে পূর্ববুদ্ধাসনস্থঃ
শমথধনু গৃহীত্বা শূন্যনৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপু নিহত্বা দৃষ্টিজালং চ ভিত্ত্বা
শিববিরজমশেকাং প্রাপ্স্যতে বোধিগ্র্যাম্।"[৫২]

A_vr

এই (কুমার) ধরণি মন্ডে পূর্বপূর্ব বুদ্ধগণের আসনে (অর্থাৎ বুদ্ধগয়ার বজ্রাসনে) সমাসীন হয়ে শমথ ধনুতে শূন্যনৈরাত্ম বাণ আরোপিত করে ক্লেশরিপু নিধন করে দৃষ্টিজাল ছিন্ন করে শিব, বিরজ, অশোক অগ্রবোধি লাভ করবেন।

এভাবে কুমার সিদ্ধার্থ প্রায় শতাধিক দিব্য ও মনুষ্যক বিদ্যা ও কলাকৌশলের পরিচয় দিলেন। তারপর কুমারের লিপিজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান কতটা আছে তা জিজ্ঞেস করা হলে প্রথমেই আচার্য বিশ্বমিত্র বললেন- শুধু মনুষ্যলোক নয়, দেব-গন্ধর্ব অসুরেন্দ্র লোকে যত লিপি আছে, কুমার সকলই অবগত আছেন, আমি বা আপনারা যাদের নামও শ্রবণ করি নাই।'' অতঃপর সংখ্যা জ্ঞান বিষয়ে অর্জুন নামক গণক মহামাত্র কুমারের পরীক্ষা নিয়ে স্তম্ভিত হলেন। কুমার এক হতে কোটিশতোত্তর সংখ্যা গণনায় পারঙ্গত। এতে সকল শাক্যগণ আশ্চর্যান্বিত ও পরম বিস্ময়াপন্ন হয়ে সমস্বরে বললেন- ''সর্বাথসিদ্ধ কুমারের জয়, জয়।'' সকলে আসন থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি হয়ে বোধিসত্ত্বকে অর্থাৎ কুমার সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে রাজা শুদ্ধোদনকে বললেন- ''মহারাজ, ''আপনি ধন্য, ভাগ্যবান যে এরূপ পুত্রের জনক হয়েছেন।''[৫৩]

অতঃপর দন্ডপাণি শাক্য নিজ কন্যা গোপাকে কুমার সিদ্ধার্থের হাতে প্রদান করলেন। চুরাশি হাজার শাক্যকন্যা তাঁর পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হলেন। গোপা তাঁদের মধ্যে অগ্রমহিষীপদে অধিষ্ঠাতা হলেন। অর্থাৎ কুমার সিদ্ধার্থ ও গোপাদেবীর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৬০৮ বা ৫৪৭ অব্দে।

UxKv I Z_¨wb‡'k

১. বুদ্ধের জীবন ও বাণী, শরৎচন্দ্র রায়, ১৯১৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, পৃ: ১
ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সেকালে শাক্যনামে একটি উপজাতি বা ট্রাইব ছিল; তাদের মধ্যে জন্ম হয়েছিল বলেই বুদ্ধ নিজেকে বার বার শাক্যপুত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

২. প্রাগুক্ত

৩. ভারতীয় দর্শন, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ১৪

৪. মহাপরিনিব্বান সুত্তং- রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, পৃ: ২৩৯

৫. শাক্যমুনি চরিত ও নির্বান তত্ত্ব, অঘোর নাথ গুপ্ত, সম্পাদনা- বারিদ বরণ ঘোষ, পৃ: ৩, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড)- কুশীনগর (প্রসাঙ্গিক তথ্য, সংখ্যা), পৃ: ১২৫-১২৬

৬. প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে নিম্নলিখিত ষোলটি জনপদের নাম পাওয়া যায়- অঙ্গ (পূর্ব বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার), কাশী, কোসল (পূর্ব বিহার), বজ্জি (উত্তর বিহার), মল্ল (গোরখপুর জেলা), চেদি (যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী), বৎস (এলাহাবাদ), কুরু (ধানেশ্বর, দিল্লী ও মীরাট জেলা), পাঞ্চাল (বেরিলি, বদাউনও ফারুক্কাবাদ জেলা), মৎস (জয়পুর), শুরসেন (মথুরা), অস্সক

(গোদাবরীর উপকূলস্থ), অবন্তি (মালব), গান্ধার (পেশোয়ার ও রাওয়ালপিন্ডি জেলা), কম্বোজ (কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং কাফিরীস্তানের অংশ)।

৭. সারনাথ তীর্থ, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী এম.এ, পৃ: ২৪-২৫

৮. ললিত বিস্তরের (৬ষ্ঠ অধ্যায়) মতে, একটি তুষার শুভ্র ষড়দন্ত হস্তী মায়াদেবীর কুক্ষিতে প্রবেশ করেছিল। (ভারহূত, সাঁচী এবং অমরাবতীতে এই দৃশ্য খোচিত আছে)।

৯. ললিত বিস্তরের (৩য় অধ্যায়) মধ্যে বোধিসত্ত্ব পাঁচটি মহাবলোকন করেছিলেন।

১০. পঞ্চশীল- পঞ্চশীল বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমই শীল। এ ত্রিবিধ দ্বারের পরিদাহ উপসম করে বলে শীল। প্রকৃতপক্ষে, ব্যবহারিক যে নিয়ম পালনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর জীবন লাভ করতে পারে এবং সমাজ জীবন সুন্দর হয়, পরিবেশ শান্ত থাকে, তা শীল নামে অভিহিত। পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি মানবজীবনের আদর্শ এবং মনুষত্ব বিকাশের মূলমন্ত্র।

১১. পঞ্চশীল (বাংলা অনুবাদ)

i) আমি প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ii) আমি অদত্তবস্তু (চুরি) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

iii) আমি মিথ্যা কামাচার-পরস্ত্রী বা পরপুরুষে গমন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

iv) আমি মিথ্যা বাক্য কথন থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

v) আমি মত্ততার কারণ-মদ, গাঁজা, নেশা দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১২. চক্রবাল হচ্ছে মহাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত সুবিশাল স্থান যার মধ্যস্থানে আছে মেরু পর্বত। মেরু পর্বতের চতুর্দিকে আছে সপ্ত সমকেন্দ্রিক পর্বত। এদের পরে আছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি মহাদেশ (মহাদ্বীপ) যেগুলো চক্রবাল পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেকটি চক্রবালের একটি করে সূর্য ও চন্দ্র আছে। এরূপ চক্রবালের সংখ্যাও অনন্ত। তিনটি চক্রবালের সংখ্যাও অনন্ত। তিনটি চক্রবালের একটি 'সমষ্টি' যারা পরস্পরের সাথে সংলগ্ন। প্রত্যেকটি চক্রবাল সমষ্টির মধ্যস্থানে যে ত্রিকোণাকৃতি স্থান আছে তা 'লোকান্তরিক' নরকের দ্বারা অধিগৃহীত।

১৩. বত্রিশ প্রকার পূর্বনিমিত্ত-

দশসহস্র চক্রবাল অপ্রমেয় আলোকে উদ্ভাসিত হল।

❖ অন্ধগণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

- ❖ বধিরগণ শব্দ শ্রবণে সক্ষম হল।
- ❖ মূকগণ বাচাল হল।
- ❖ কুব্জগণ ঋজুদেহী হল।
- ❖ পঙ্গুগণ গমনশক্তিলাভ করল।
- ❖ কারারুদ্ধ বন্দিগণের বন্ধনরজ্জু খসে পড়ল।
- ❖ নরকাগ্নি নির্বাপিত হল।
- ❖ প্রেতলোকবাসীদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরীভূত হল।
- ❖ ভয়ার্ত তির্যক জাতির ভয় দূর হল।
- ❖ সকল জীবের রোগ ব্যাধি এক সঙ্গেই অপসৃত হল।
- ❖ সত্ত্বগণ প্রিয়ভাষী হল।
- ❖ অশ্বগণ মধুর স্বরে হ্রেষারব করল।
- ❖ গজগণ মধুরস্বরে বৃংহণ রব করল।
- ❖ তূর্য সমূহ আপনা হতেই নিজ নিজ সুরে বেজে উঠল।
- ❖ বিনা আঘাতেই মনুষ্য অঙ্গ পরিহিত আভরণ সমূহ ঝংকৃত হল।
- ❖ সর্বদিক আলোকাজ্জ্বল হল।
- ❖ প্রাণীগণের সুখোদ্দীপক মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল।
- ❖ আকাশ হতে অকাল বৃষ্টি বর্ষিত হল।
- ❖ পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেদ করে জলধারা উত্থিত হল।
- ❖ পক্ষিসমূহের অন্তরীক্ষে বিচরণ (সাময়িকভাবে) বন্ধ হল।
- ❖ নদীসমূহের স্রোত ক্ষণকাল স্তব্ধ হল।
- ❖ মহাসমুদ্রের লবণাম্বু মধুরস্বাদ যুক্ত হল।
- ❖ পঞ্চবর্ণ পদ্মপুষ্পে সর্বদিক সমাচ্ছন্ন হল- স্থলের পদ্মস্থলে, জলের পদ্ম জলে, বৃক্ষস্কন্ধে স্কন্ধপুষ্প, শাখায় শাখাপদ্ম এবং লতায় লতাপদ্ম প্রস্ফুটিত হল।
- ❖ পাষাণভেদ করে দন্ড পদ্ম উপর্যুপরি সপ্তদন্ডে প্রস্ফুটিত হল।
- ❖ অন্তরীক্ষে দোদুল্যমান পদ্ম প্রস্ফুটিত হল।
- ❖ সর্বদিক হতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

❖ আকাশে দিব্যতুর্য নিনাদিত হল।

❖ দশ সহস্রী চক্রবাল একত্র রাশিকৃত পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় আবর্তিত ও আন্দোলিত, সুসংবদ্ধ মাল্যপিন্ডে প্রস্তুত সমলংকৃত পুষ্পাসনের ন্যায় ও মাল্যপতাকা সঞ্চালিত বিজলীর ন্যায় পুষ্প ধূপ ও সুগন্ধ দ্রব্যাদিতে সুগন্ধিত ও আমোদিত হয়েছিল।

— জাতকনিদান কথা (P.T.S) পৃষ্ঠা: ৫০

ঐ বঙ্গানুবাদ, ধর্মপাল ভিক্ষু, কলিকাতা, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১

— জিনালংকার, শ্লোক নং- ৩৫

১৪. অমরাবতীতে এই দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে। শুদ্ধোদন অশোক কুঞ্জে মায়াদেবীর সাথে সাক্ষাৎ করছেন। অন্য একটি দৃশ্যে ব্রাহ্মণগণ রাজার কাছে স্বপ্নের ফল বর্ণনা করছেন।

১৫. জাতক নিদান কথা (P.T.S) পৃষ্ঠা: ৪৯

ঐ বঙ্গানুবাদ, ধর্মপাল ভিক্ষু, পৃষ্ঠা: ৬৯-৭০

মহাপদান সূত্র, দীর্ঘনিকায়, ২য় খন্ড, সূত্র নং-১৪

১৬. মহাবস্তুর (১০ম ভূমিকা) মতে, মায়াদেবী পিত্রালয়ে নয় লুম্বিনী উদ্যানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

১৭. অভিনিষ্ক্রমন সূত্র (Beal, পৃ: ৪১-৫৩) এর মতে, মায়াদেবী যখন পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় তখন তাঁর পিতা সুপ্রবুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন যাতে মহামায়াকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য দেবদহে পাঠানো হয়। সন্তান প্রসব করার পর তিনি মহামায়াকে কপিলাবস্তুতে পাঠাবেন, রাজা শুদ্ধোদন যথোচিত রাজকীয় মর্যাদায় মহামায়াকে দেবদহে পাঠালে সুপ্রবুদ্ধ স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা সহকারে স্বাগত জানালেন। একদিন সুপ্রবুদ্ধ কন্যাকে নিয়ে লুম্বিনী উদ্যানে গিয়েছিলেন। সুপ্রবুদ্ধের প্রধানমন্ত্রীর পত্নীর নামানুসারে এই উদ্যানের নাম লুম্বিনী রাখা হয়েছিল। সেই উদ্যানে মহামায়া একটি আনত পলাশবৃক্ষের শাখা ধারণ করে দাঁড়িয়েছিলেন।

❖ Hendrick de Silva Hettigoda,
Jivitaya ha Grahayo
(Live & Planets)
Colombo, Reprint 1980, P. 327

১৮. মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র শেষের তিন জন্মে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বোধিসত্ত্বের বাক্যস্ফুরণ হয়েছিল। মহৌষধ জন্মে (জাতক কাহিনী নং ৫৪৬), বিশ্বন্তর জন্মে (জাতক কাহিনী নং ৫৪৭) ও

বর্তমান জন্মে। মহৌষধ জন্মে মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময়ে দেবরাজ শক্র এসে তাঁর হাতে যে চন্দন সার ঔষধ দিয়েছিলেন, তা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই তিনি মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁকে মাতা জিজ্ঞেস করেছিলেন- ''বৎস তুমি হাতে কি নিয়ে আগমন করেছ?'' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিয়েছিলেন- ''মা, আমি ঔষধ নিয়ে আগমন করেছি।'' সেই ঔষধ মৃৎপাত্রে স্থাপন করেছিলেন। তা সমাগত অন্ধ বধিরগণের এবং অন্যান্যদের সর্বরোগহর ভেষজে পরিণত হয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর নাম রাখা হয় 'মহৌষধ কুমার'।

বেশ্বন্তর জন্মে মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে জননীকে বলেছিলেন- ''মা, দান দেওয়ার মত ঘরে কিছু আছে কি? আমি দান দিব।'' তখন মাতা বলেছিলেন- ''বৎস, তুমি ধনশালীর গৃহেই জন্মগ্রহণ করেছ''- এই বলে পুত্রকে সহস্র কার্ষাপণ পূর্ণ একটি থলি উপহার দিয়েছিলেন।

বর্তমান জন্মেও তিনি জন্মমাত্র সিংহনাদ করে বলেছিলেন- ''আমিই জ্যেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ।'' এভাবে বোধিসত্ত্বের শেষের তিন জন্মে মাতৃকুক্ষি থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্রই বাক্যস্ফুরণ হয়েছিল।

১৯. ক্রমেণ গর্ভাদভিনিঃসৃতঃ সন্ বভৌ চ্যুতঃ খাদিব যোন্যজাতঃ।
কল্পেষ্বনেকেষু চ ভাবিতাত্মা যঃ সম্প্রজানন্ সুষুবেন মূঢ়ঃ ॥
মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, জগন্নাথ বড়ুয়া, বুদ্ধচরিতম্, ১ম সর্গ, গাথা নং-১১, পৃ: ১৭৪

২০. বোধায়জাতোহস্মি জগদ্ধিতার্থমন্ত্যা ভবোৎপত্তিরিযং মমেতি।
চতুর্দিশং সিংহগতির্বিলোক্য বাণীং চ ভব্যার্থকরীমুবাচ ॥
মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, জগন্নাথ বড়ুয়া, বুদ্ধচরিতম্, ১ম সর্গ, গাথা নং-১৫, পৃ: ১৪৮)

২১. রাজকুমার আনন্দ বুদ্ধের সহজাত- একথা অন্যত্র পাওয়া যায়না, কেবল জাতক নিদানেই (পৃষ্ঠা-৫২) আছে।

২২. নগরং কপিলাবত্থু মে রাজা সুদ্ধোদনো পিতা
ময়হং জনেত্তিকা মাতা মায়াদেবী'তি বুচ্চতি। (বুদ্ধবংসো, গোতম বুদ্ধবংসো, গাথা-১৩)
বুদ্ধবানীর মূলতত্ত্ব, ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রানী বড়ুয়া
ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ইংরেজী, ২৫৫৩ বুদ্ধাব্দ, ঢাকা, পৃ: ১৫

২৩. সিংহলীগণনা অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধের জন্ম সাল খ্রীঃ পূঃ ৬২৩ এবং বর্তমানে বৌদ্ধ বিশ্বে এটা গৃহীত হয়েছে।

গৌতমবুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক (জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮, ঢাকা-১০০০) পৃ: ১৪

২৪. সব্বার্থ সিদ্ধ প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুন মুদ্রণের ভূমিকা, ড. বারিদবরণ ঘোষ, পৃ: ১৮। জন্মের পঞ্চম দিনে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর নামকরণ করেন। সিদ্ধার্থ (পালিভাষা-সিদ্দাত্ত) যার অর্থ লক্ষ্য পূরণ হয়েছে।

২৫. কবিতাংশ- বুদ্ধদেব চরিত- গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক (জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮, ঢাকা-১০০০) পৃ: ১৬

২৬. শাক্যদের মধ্যে নানা গোত্র ছিল। একটি গোত্রের নাম গোতম। বুদ্ধ এই গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন বলেই গোতম বা গৌতম নামে পরিচিত।

গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক (জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮, ঢাকা-১০০০) পৃ: ১৬

২৭. জাতক নিদান, ধর্মপাল ভিক্ষু (কলিকাতা, ২৫০৬ বুদ্ধ), পৃ: ৭৭

২৮. মহাপুরুষ লক্ষণ- যথাঃ

সিদ্ধার্থের মস্তকে উষ্ণীষের চিহ্ন; তাঁর কেশসমূহ কৃষ্ণ বর্ণ ও দক্ষিণ দিকে আকুঞ্চিত; তাঁর ললাট সমতল ও বিপুল; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ উর্ণাঙ্কৃত; তাঁর নেত্র নীলবর্ণ এবং চত্বারিংশৎ দন্তই তুল্যাকৃতি; দন্তসমূহ ঘনসন্নিবিষ্ট ও শুক্লবর্ণ; তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর; রসনার অগ্রভাগ রসাভিষিক্ত; জিহ্বা বৃহৎ ও কৃশ; তাঁর হনু সিংহের হনুর ন্যায়; তাঁর স্কন্ধদেশ বর্ত্তুলা কৃতি ও উন্নত; তাঁর কান্তি সুবর্ণের ন্যায়; তিনি স্থির; তাঁর ভুজদ্বয় অবনত ও প্রলম্বিত; শরীরের পূর্বভাগ সিংহের ন্যায়; কটিদেশ ন্যাগ্রোধ তরুর ন্যায় পরিমন্ডল; শরীরের ঘন রোমরাজি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; উরুদেশ সুগোল; জঙ্ঘাদেশ মৃগের ন্যায়; তাঁর অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ; তাঁর পানি ও পাদ আয়ত ও কোমল; হস্ত ও পদতল রেখাজাল সমন্বিত; পাদদ্বয়ের তলদেশ চক্রাঙ্কিত, বিচিত্র ও শুভ্র; পাদদ্বয় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমান।

২৯. অশীতি অনুব্যঞ্জন- যথাঃ

সিদ্ধার্থের নখ সকল উন্নত, তাম্রবর্ণ ও স্নিগ্ধ; তাঁর অঙ্গুলি সকল বর্ত্তুলাকৃতি ও ক্রমনিম্ন; গুল্ফ ও শিরা সকল অদৃশ্য; দেহের সন্ধি সকল দৃঢ়; পাদদ্বয়ের পার্শ্বদেশ আয়ত; হস্তের রেখা সকল স্নিগ্ধ, তুল্যাকৃতি, গম্ভীর, অবক্র ও ক্রমনিম্ন ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলের ন্যায় আরক্ত; তাঁর শব্দ অনুচ্চ; জিহ্বা কোমল ও রক্তবর্ণ; তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর, গম্ভীর ও সুস্পষ্ট; বাহুদ্বয় প্রলম্বিত; দেহ পবিত্র, মৃদু বিশাল,

অদীন, অপূর্ব, সুসমাহিত ও সুবিভক্ত। জানুমন্ডল বিপুল ও সুপরিপূর্ণ; গাত্র বৃত্তাকৃতি, সুমার্জিত; নাভি গভীর; অজিহ্ম ও অনুপূর্ব; তাঁর আকার পবিত্র, দেহ প্রসন্ন; দেহপ্রভা সুবিশুদ্ধ, তিনি গজের ন্যায় মন্থরগতি, তাঁর প্রদক্ষিণ গামিতা, তাঁর কুক্ষি বৃত্তাকৃতি ও অজিহ্ম; উদর ধণুর ন্যায়, শরীর রন্ধ্র শূন্য; দন্ত বৃত্তাকৃতি তীক্ষ্ম ও অনুপূর্ব; নাসিকা তুঙ্গ; নয়ন পবিত্র সুবিমল, প্রহসিত, আয়ত, বিশাল ও নীল কবুলয় দলের সদৃশ; ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত, বিচিত্র, সংগত, অনুপূর্ব, কৃষ্ণবর্ণ; গন্ডদেশ পীন, অবিষম, গন্ডদোষ বিমুক্ত; কর্চু অনুপহত; ইন্দ্রিয় সকল তীক্ষ্ম ও সুপরিপূর্ণ। মুখ ও ললাট পরস্পর সুসংগত, পরিপূর্ণ মস্তক, কেশদাম কৃষ্ণবর্ণ, সুসংগত, সুরভি; অপরুষ, অনাকুল, অনুপূর্ব, সঙ্কুচিত ও সুসংস্থিত।

৩০. অন্যনাম 'নালক সুত্ত' সুত্তনিপাত, গাথা নং ৬৭৯-৭২৩, জাতক, ১ম, পৃ: ৫৫

৩১. ঊনত্রিশ বছর বয়সে কুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তখন উক্ত আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কোন্ডণ্য ব্যতীত আর সকলেই দেহত্যাগ করেছিলেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়ে কোন্ডণ্য অপর সপ্ত ব্রাহ্মণ-তনয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- ''কুমার সিদ্ধার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন। তোমাদের পিতৃদেবগণ বেঁচে থাকলে তাঁরাও গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন। যদি তোমাদের সম্মতি থাকে তাহলে চল যাই আমরা ভাবিবুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।''

কিন্তু এতে তাঁরা সকলে একমত হতে পারলেন না। তিনজন প্রব্রজ্যা গ্রহণে অনিচ্ছুক হলেন। অপর চারজন কোন্ডণ্যকে প্রধান করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করলে এই পাঁচজন পরবর্তীকালে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

৩২. এটাই বুদ্ধগণের ধর্মতা যে, তাঁদের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁদের মাতার তিরোধান হবে। অতীতেও সমস্ত বুদ্ধগণের সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল, বর্তমানেও তাই হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ স্বয়ং আনন্দকে বলেছিলেন- ''হাঁ, আনন্দ, বোধিসত্ত্বগণের মাতৃগণ স্বল্পায়ুঃ। বোধিসত্ত্বের জন্মের সপ্তম দিবসে কালগত হয়ে তাঁরা তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন।''- উদান, সোমবগ্গ, অপ্পায়ুক সুত্ত।

৩৩. সারনাথ তীর্থ, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী এম.এ, পৃ: ২৫

৩৪. বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পরিষদ- গ্রন্থমালা, প্রথম সংখ্যা, সনাতন হিন্দু, মহামহোপাধ্যায় শ্রী প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পৃ: ১৮৪

৩৫. মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থ মতে, 'সর্বমিত্র' (পালি সব্বমিত্ত) যিনি উদীচ্য পরিবারের ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং যিনি ছিলেন পদক, বৈয়াকরণ এবং ষড়ঙ্গশাস্ত্রবিদ- মিলিন্দ প্রশ্ন (PTS) পৃ: ২৩৬

৩৬. গান্ধার শিল্পে আছে বোধিসত্ত্ব রথারোহণে বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গীসাথীরা পদব্রজে যাচ্ছেন- সকলের হাতে ঝুলন্ত কালির দোয়াত ইত্যাদি ছিল।

৩৭. ললিত বিস্তরে 'শুদ্ধাবর' উল্লেখ রয়েছে 'শুভাঙ্গ' রূপে।

❖ অতীত দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভাষার অনুশীলন দ্বারা প্রতীয়মান হয়: ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৪, এবং ক্ষ-কার একটি স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ এই চৌত্রিশটির অন্তর্ভূক্ত। বরদাতন্ত্র, বর্ণাভিধান তন্ত্র, কামধেনুতন্ত্র ইত্যাদি হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থে ''ক্ষ'' একটি স্বতন্ত্র বর্ণ বলে বর্ণিত হয়েছে। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে-

পঞ্চাশল্লিপিভির্মালা বিহিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।
অকারাদি ক্ষ কারান্ত বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা॥

(গৌতমীয় তন্ত্র)

অকারাদি ক্ষ কারান্ত পঞ্চাশৎ বর্ণমালা রয়েছে; যথা-

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ

১৬ স্বরবর্ণ

ক, খ, ঘ, ঙ; চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ; ত, থ, দ, ধ, ন; প, ফ, ব, ভ, ম; য, র, ল, ব, শ; ষ, স, হ, ক্ষ

৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ

একুনে ৫০ বর্ণ।

৩৮. ''আশ্চর্যং শুদ্ধসত্ত্বস্য লোকে লোকানুবর্তিনো
শিক্ষিতঃ সর্বশাত্রেষু লিপিশালামুপাগতঃ।
যেষামহং নামধেয়ং লিপীনাং ন প্রজানামি।
তত্রৈষ শিক্ষিত সন্তো লিপিশালামুপাগতঃ॥''

ললিতবিস্তর, ১০/৬-৭

৩৯. তিব্বতী বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে কুমার 'সুলভ' নামক আচার্যের কাছে হস্তী বিদ্যা (হস্তীদমনবিদ্যা) এবং 'সহদেব' নামক আচার্যের কাছে ধনুবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

Rockhill পৃ: ১৯

৪০. বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৫০

৪১. ললিত বিস্তর- বুদ্ধ জীবনী সংক্রান্ত এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এটা সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে বিরচিত, পদ্যভাগ প্রাচীনতর। এই গ্রন্থে কতকগুলো অধিকতর প্রাচীন পালিগাথা সন্নিবেশিত। এই গ্রন্থ তিব্বতী ও চীনাভাষায় একাধিকবার অনুবাদিত হয়েছে। ফরাসি পন্ডিত ফুকো (FOUCAUX) এই তিব্বতীয় অনুবাদের ফরাসি অনুবাদ করেন। তাঁর মতে, তিব্বতীয় অনুবাদের কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দী। চীন দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই গ্রন্থ ৭৬ খ্রিষ্টাব্দে চীনা ভাষায় অনুদিত হয়। তাহলে খ্রিষ্টাব্দ প্রবর্তনের পূর্বেই ঐ গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল বলতে হয়। ললিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হতে ধর্মপ্রচার আরম্ভ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থটি পন্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি হতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ব্যাবৃত্তে তিমির নুদস্য মন্ডলেহপি
বোমাভং শুভবর লক্ষণা গ্রধারিং
ধ্যায়ন্তং গিরিসব নিশ্চলং নরেন্দ্রপুত্র
সিদ্ধার্থং ন জহাতি সৈব বৃক্ষছায়া।

ললিত বিস্তর— একাদশ অধ্যায়

৪২. চিন্ময় বঙ্গ, শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবন্ধ, বীরাচার ও পশ্বাচার, পৃ: ১

৪৩. ভারতের বিবাহের ইতিহাস, অতুলসুর, পৃ: ৩৮

বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বৌদ্ধ বিবাহে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কোন বাহুল্য ছিলনা। যা অনুষ্ঠান ছিল তা খুব সরল প্রকৃতির এবং বিবাহ ছিল একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ তার মাতুল কন্যা যশোধরাকে বিবাহ করেন। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের ছেলেরাও অনেক সময় মামাতো বোনকে (মাতুল ধীতরং) বিয়ে করত। তরুন সিদ্ধার্থের সংসার বিমুখতা এবং বেশি চিন্তা প্রবণতা দেখে শুদ্ধোদনের ভয় হয়, হয়ত তার পুত্রও সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবেন। তাই তিনি প্রতিবাসী কোলিয়গণের (প্রজাতন্ত্রের) সুন্দরী কন্যা ভদ্রা কপিলায়নীর (যশোধরা) সঙ্গে বিবাহ দেন।

৪৪. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ: ১০৬

৪৫. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ: ১০৬

৪৬. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ: ১০৭-১০৮

৪৭. "ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং কন্যাং মে প্রবেদয়॥
ন কুলেন না গোত্রেন কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ॥"

ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ.১০৯

৪৮. গোপা=যশোধরা=ভদ্দকচ্চানা=বিম্বা=রাহুল মাতা

মালালাসেকেরার মতে, গৌতমের ভার্যার প্রকৃত নাম ছিল বিম্বা। ভদ্দকচ্চানা, যশোধরা ইত্যাদি হচ্ছে বিশেষণ।

-DPPN, ২য় খন্ড, পৃ: ৭৪১

একমাত্র থেরী ভদ্রা কাপিয়ালিনী ছাড়া এই নাম গৌতমের স্ত্রী হিসেবে অন্য কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়না। কোথাও কোথাও গোপা নাম্নী রমণীর সঙ্গে গৌতমের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- ''গভীর রাত্রি, রাজপুরবাসীরা নিদ্রিত। সিদ্ধার্থ বিনিদ্রভাবে তার সুপ্ত পত্নী গোপার কক্ষে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তখন তিনি তাঁর হৃদয়ের নিভৃত স্থানে বাণী শুনলেন, সময় উপস্থিত।''

বুদ্ধের জীবন ও বাণী, শরৎচন্দ্র রায়, ১৯১৭, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, পৃ: ১১

শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব- অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, পৃ: ৩৩

তিনি ছিলেন গৌতমবুদ্ধের পত্নী যশোধরা বা গোপা বা বিম্বাদেবী, যিনি সাহিত্যে রাহুলমাতা নামে বিশেষভাবে পরিচিত। কোন এক সময় গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তুতে রাহুল মাতার গৃহে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রবধুর গুণকীর্তন করতে আরম্ভ করেন। এগুলোতে পতিব্রতা রমণীর বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এ থেকে জানা যায় যে, যশোধরা যখন শুনলেন সিদ্ধার্থ কাষায় বস্ত্র ধারণ করেছেন, তার স্বামী আর মালাগন্ধাদি ব্যবহার করেননা, তখন নিজেও ঐ সকল বিলাসদ্রব্য ত্যাগ করলেন এবং ভূমি শয্যায় শয়ন করতে আরম্ভ করলেন। এই সময় অনেক রাজকুমার পাণিপ্রার্থী হয়ে তার কাছে অনেক উপহার পাঠান। কিন্তু তিনি সকল উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি সিদ্ধার্থ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা হৃদয়ে স্থান দেননি (চন্দ্রকিন্নর জাতক, সংখ্যা ৪৮৫)

স্বামী ও পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর তিনিও গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন। (জাতক সংখ্যা ৪৮৫) পালি সাহিত্যে নারী, ড. বাণী চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা), শ্রী সুকুমার সেন গুপ্ত, পৃ: ৩০

৪৯. ''জাতক নিদান'' অনুসারে বিবাহের পরেই বোধিসত্ত্ব জ্ঞাতিগণের কাছে তার শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

৫০. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ: ১১২, হিউয়েন সাঙ কপিলাবস্তু নগরের দক্ষিণদ্বারে একটি স্তূপ দেখেছেন। সম্ভবত ঐ স্থানেই হস্তীদেহ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে সেখানে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে ঐ স্থানের নাম হাতীগড় বা হাতীকুন্ড কানিংহামের 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫১. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা) পৃ: ১১৭-১২০; তিব্বতী সাহিত্যেও এর বর্ণনা আছে (Rockhill, P.19); কিন্তু পালিতে নেই।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১২শ খন্ড, পৃ: ১৮৮

৫২. ললিত বিস্তর (দ্বারভাঙ্গা), পৃ: ১২০

৫৩. মহাবস্তু (২য় খন্ড, পৃ: ৪৮) মতে, মহানাম এবং ললিত বিস্তর এর মতে, দন্ডপাণি (যিনি সুপ্রবুদ্ধের ভ্রাতা); মতান্তরে সুপ্রবুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

e×Ë jvf

wbwgË ‘kb

‘‘সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়ং পরমে ব্যোমন।
সোশ্নুতে সর্বান কামানসহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।’’[১]

যৌবনে এসে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য ভাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠলেও বাল্যকাল থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার লক্ষ্যণীয়। যৌবনকালে সেই বৈরাগ্যভাব বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধার্থ গৌতমকে সংসারমুখী করার জন্য তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদন অপরূপ রূপবতী গুণবতী ললনার সন্ধান করে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেন। রাজা শুদ্ধোদন তাঁর পুত্রের ভোগ-বিলাসের কোন ত্রুটি রাখেননি। রূপবতী গুণবতী গোপার সাথে বিবাহের পর কুমার সিদ্ধার্থের মহাসম্পদের মধ্যে পরমানন্দে ত্রয়োদশ বছর অতিবাহিত করে ফেললেন। বর্তমানে তাঁর বয়স পরিপূর্ণ ঊনত্রিশ বছর। রাজা শুদ্ধোদন কুমার সিদ্ধার্থকে ডেকে একদিন বললেন, “রাজ্যের সব প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পীগণ এসেছেন তোমার প্রমোদাগার আরো মনোরম শিল্পে নির্মাণ করতে, তুমি সম্মত হলে তাদেরকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।” কুমার প্রত্যুত্তরে বললেন-

“পিতা এই ক্ষুদ্র প্রমোদগোরে
প্রাণ নাহি ভরে মম।”

পুত্রের এরূপ প্রত্যুত্তর রাজা শুদ্ধোদন আশা করেননি। কারণ তিনি শুধুমাত্র পুত্রের সুখের জন্য রাজকোষ প্রায় শূন্য করেই এ রাজপুরী সাজিয়েছিলেন। তবুও কুমারের মন এই সংসারে থাকতে চাইছেনা। কুমার সিদ্ধার্থ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে তাঁর বৈরাগ্যভাব এরূপে প্রকাশ করেছেন-

‘‘প্রিয় গোপা! আমার যেন কেন বারবার মনে হয় অজ্ঞান অন্ধকারে এ সংসারের মধ্যে আছি, কী কাজে আমি পৃথিবীতে এসেছি আর কী কাজ করে আমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। এই যে চারদিকে অসম্বন্ধের প্রাচীর, মনে হয় আমি যেন আনন্দের আতিশয্যে কারাগারে বন্দী হয়ে আছি। এ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার মন সর্বক্ষণ চঞ্চল। মনে হয়, বিশ্বে যে যেখানে আছে তাকে ভ্রাতৃত্বভাবে বুকের কাছে তুলে ধরি। কীটপতঙ্গ, হিংস্র-পশু সবাই যেন আমার বন্ধু, আমি যেন সবার।’’[২]

কুমার সিদ্ধার্থ একদিন পিতার কাছে কিছুক্ষণের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত ভবনের বাইরে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু পিতার মন কিছুতেই পুত্রকে রাজ-আঙ্গিনার বাইরে যেতে দিতে রাজী নন। অবশেষে পুত্রের ইচ্ছা পূরণের জন্য অনুমতি দিলেন। আদেশপ্রাপ্ত সারথি শ্রেষ্ঠ রথটি সর্বালংকারে সাজিয়ে তাতে কুমুদ শুভ্র চারটি সিন্ধুদেশজাত অশ্ব যোজন করে রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে নিবেদন করলেন। সিদ্ধার্থ সারথিকে সঙ্গে নিয়ে সজ্জিত রাজপথে আরোহন করে উদ্যানাভিমুখে যাত্রা করলেন।[৩]

এমন সময় শুদ্ধাবাসকায়িক দেবতাগণ ভাবলেন- বোধিসত্ত্বের সম্বোধিলাভের কাল আসন্ন। অতএব, তাঁকে এখন আমরা পরপর চার পূর্বনিমিত্ত (জরাগ্রস্ত ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী) প্রদর্শন করাব। দেবতাগণের এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বোধিসত্ত্বের চার পূর্ব নিমিত্ত দর্শন সম্পন্ন হয়।

c_g wbwgË ‘kb

রাজার আদেশে রাজ্যের সর্বস্তরে প্রচার করা হলো যে, আগামীকাল রাজকুমার নগর ভ্রমণে বের হবেন। ভোরের সূর্য ক্রমশ মধ্যাহ্নে এসে দাঁড়ায়, তারপর আসে সন্ধ্যা। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে বললেন, ‘‘সুসজ্জিত নগর কপিলাবস্তুর লুম্বিনী দেখলাম, আর দেখলাম যতদূর প্রদক্ষিণ করা যায় রাজ্যের সীমানা, তার ভেতরকার প্রজাকূল সকলেই যেন আমার আগমনের আয়োজনে নতুন সাজে সেজেছে।’’ কিন্তু রাজকুমার বুঝতে পেরেছেন যে, এটা রাজ্যের প্রজাকুলের সাধারণ অবস্থা নয়। তাই তিনি রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছন্দককে ধীর পায়ে তার সাথে নগর পরিভ্রমণের আদেশ দিলেন। প্রকৃতি যেন আজ দেবতার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পেয়ে মুগ্ধ, তাই জড়িয়ে ধরতে চায় লতায় লতায় মানবরূপী দেবতার শ্রীচরণ, দূর দিগন্তে ধীর পায়ে নামে সূর্য, আর আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। হঠাৎ রাজকুমার সিদ্ধার্থের চোখে প্লাবিত জ্যোৎস্নার স্রোতে কাঁপতে থাকে প্রেত ছায়ার মতো মানুষের বিকৃত শরীর। অর্থাৎ এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কুমারের সামনে উপস্থিত হলেন। রাজকুমার তাকে দেখলেন- জরায় অভিভূত, অন্য মানুষ থেকে পৃথক। তিনি অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে তার প্রতি নিষ্কম্প ও নিবিষ্ট দৃষ্টি রেখে সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘‘এই ব্যক্তি কে? ক্ষীণকায়, দূর্বল, বক্রদেহ, পলিতকেশ, চক্ষু কোটরাগত, যষ্টিতে ভর দিয়ে কেঁপে কেঁপে এগিয়ে চলছে। আহা! তার কী কষ্ট! কী বিকৃত কলেবর।’’ দেবতাদের প্রভাবেই সারথির বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হলো। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করলে সারথি কোনো দোষ দর্শন না করেই গোপনীয় বিষয় রাজপুত্রকে নিবেদন করলেন। সারথি বলল- ‘‘জরার প্রভাবে এই ব্যক্তির দেহ ভেঙ্গে পড়েছে, রূপের ধ্বংসকারী, শক্তির বিপত্তি, শোকের কারণ, আনন্দের মৃত্যু, স্মৃতির নাশ আর

ইন্দ্রিয়ের শত্রু হলো এই জরা। এও শৈশবে দুগ্ধ পান করেছে, আবার যথাকালে পৃথিবীতে সর্বত্র ভ্রমণ করেছে, ক্রমে সুন্দর কান্তি যুবাপুরুষ হয়ে ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়েছে।'' সারথির কথা শুনে রাজকুমার কিঞ্চিৎ বিচলিত হলেন। তিনি সারথিকে বললেন-''আমারও কি সেই দোষ হবে?'' সারথি প্রত্যুত্তরে রাজকুমারকে বললেন-''যিনি আয়ুষ্মান কালবশে অবশ্য তাঁরও এরকম বয়োবৃদ্ধি হবে। মানুষ এভাবেই জরার সাথে রূপধ্বংসী হিসেবেই পরিচিত এবং তাকেও প্রার্থনা করে।'' রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''সারথি রথ ফিরাও। কে এই দুঃখময় দৃশ্য দেখে আমোদ-প্রমোদে রত থাকতে পারে?'' এরূপে বোধিসত্ত্বের প্রথম নিমিত্ত দর্শন সম্পন্ন হল।

wØZxq wbwgË ‘kb

রাজকুমার সিদ্ধার্থ দ্বিতীয় দিন রাজা শুদ্ধোদনের অনুমতি নিয়ে পুনরায় নগর পরিভ্রমণে বের হলেন। পথিমধ্যে অনুরূপভাবে দেবতাদের প্রভাবে রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাস্তার ধারে একজন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলেন। যিনি কৃশোদর, দুর্বলকায়, নিজের মলমূত্রে ম্রক্ষিত এবং অতিকষ্টে শ্বাস গ্রহণ করছেন। তাকে দেখে তার প্রতিই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে শুদ্ধোদন পুত্র সারথিকে বললেন উদর স্থুল শ্বাসে শরীর কম্পিত, স্কন্ধ শিথিল। বাহু কৃশ, দেহ পান্ডুর-অন্যকে আশ্রয় করে করুণস্বরে ''মা মা'' বলে আর্তনাদ করছে, এই ব্যক্তি কে? তখন সারথি উত্তরে বললেন- হে সৌম্য, ধাতুর প্রকোপ থেকে উৎপন্ন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই গুরুতর অনর্থের নাম রোগ যা শক্তিমান এই ব্যক্তিকেও পরাধীন করেছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় নিরীক্ষণ করে বললেন, এই দোষ কি পৃথকভাবে শুধুমাত্র এই ব্যক্তিরই উৎপন্ন হয়েছে, না সাধারণভাবে সমস্ত মানুষেরই রোগভয় বর্তমান? সারথি বললেন- সাধারণভাবে সব মানুষই এই দোষভাগী। এভাবে রোগে পীড়িত হতে হতে রোগক্লিষ্ট মানুষ আনন্দ লাভ করে। এই তত্ত্বকথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিষন্নচিত্তে জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের মতো কাঁপতে লাগলেন। তারপর করুণার্দ্র কণ্ঠে মৃদুস্বরে বললেন- মানুষের এই রোগ-সঙ্কট দেখেও জগৎ নিশ্চিত থাকে। হায়! মানুষের অজ্ঞান কি বিপুল, এরা রোগভয় থেকে অমুক্ত থেকেও হাসে। হে সারথি, রোগভয়ের কথা শুনে আমার মন আনন্দ থেকে নিবৃত্ত, আমার হৃদয় সংকুচিত। নিরানন্দ চিত্তে তিনি ফিরে এলেন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। এভাবে বোধিসত্ত্বের দ্বিতীয় নিমিত্ত দর্শন সম্পন্ন হল।

ZZxq wbwgË ‘kb

রাজকুমার সিদ্ধার্থকে পর পর দু’বার এভাবে নিরানন্দ ও চিন্তামগ্ন চিত্তে প্রাসাদে ফিরতে দেখে রাজা শুদ্ধোদন ভাবলেন, তিনি পুত্রের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন। তিনি পথের শোধনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন কিন্তু তাদের প্রতি রুষ্ঠ হয়ে কঠোর দন্ড দিলেন না। তিনি পুত্রের জন্য বিচিত্র ভোগ্য বিষয়ের ব্যবস্থা করলেন। যখন তাঁর পুত্র বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং ইন্দ্রিয় বিষয় দিয়ে অন্তঃপুরে আনন্দ লাভ করলেননা তখন তিনি পুত্রকে নগরভ্রমণের আদেশ দিলেন। রাজা শুদ্ধোদন ভাবলেন- এতে হয়তো তার পুত্রের ভাবান্তর ঘটবে। স্নেহবশত পুত্রের ভাব উপলব্ধি করে কাজের কোন দোষের কথা বিবেচনা করলেন না। ভূপতি শুদ্ধোদন যোগ্য, কলাকুশল এবং মুখ্য বারাঙ্গনাদের সেখানে থাকতে নির্দেশ দিলেন। তারপর রাজপথ বিশেষভাবে সুসজ্জিত ও পরীক্ষিত হলো। রাজা সারথিও রথ পরিবর্তন করে কুমারকে নগর ভ্রমণে পাঠালেন।

পুনরায় অনুরূপভাবে দেবতাদের প্রভাবে রাজকুমার সিদ্ধার্থ এক নদীর ধারে একটি হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখলেন। এই দৃশ্য দেখে রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘‘একি সারথি, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত খাটের উপর শায়িত চারজন কাঁধে করে কোথায় নিয়ে যায়? লোকজন কেনই বা তার পেছনে পেছনে করুণ আর্তনাদ ও বক্ষে করাঘাত করছে?’’ এরপর শুদ্ধচিত্ত ও শুদ্ধাধিবাস দেবগণই সারথির চিত্ত অভিভূত করলেন। অবক্তব্য হলেও সারথি রাজকুমারের কাছে তার সত্যতা ব্যক্ত করে ফেললেন। সারথি বলল- ‘‘এই ব্যক্তি এখন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন। এখন সে সুপ্ত, সঙ্গাহীন তৃণ বা কাষ্ঠে পরিণত। তার পরম প্রিয়জনেরা তাকে লালন-পালন করেছে কিন্তু এখন এই ব্যক্তি পরিত্যক্ত।’’ সারথির মুখে এই কথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কিছু ক্ষুব্ধ হয়ে সারথিকে বললেন- এটি কেবল এই ব্যক্তিরই ধর্ম না সকলেরই এই পরিণাম? সারথি প্রত্যুত্তরে বলল-‘‘সকল মানুষেরই এটা অন্তিম ধর্ম। জগতে হীন, মধ্যম বা মহাত্মা সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।’’ রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর স্বরে বললেন- প্রাণী মাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত তবু জগৎ ভয় ত্যাগ করে ভুল করে। মনে হয়, মানুষের মন কঠিন, কেননা তারা মৃত্যুর পথে থেকেও উদ্বেগহীন। এই বলে তিনি সারথিকে রথ ফিরিয়ে নিতে বললেন। এরূপে বোধিসত্ত্বের তৃতীয় নিমিত্ত দর্শন সম্পন্ন হল।

PZ_ wbwgË ‘kb

রাজা সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং ভাবলেন- এটা কিভাবে সম্ভব হল! তৎসঙ্গে তথাগত সিদ্ধার্থের জন্মের পর নিজপুত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে পুত্রকে হারানোর ভয়ে ভীত হলেন। এতে তিনি আরও কঠোরভাবে আদেশনামা জারি করে ঘোষণা করলেন- চতুর্দিকে এক এক যোজন ব্যবধানের মধ্যে আরও অধিকতর প্রহরী নিযুক্ত করা হোক। রাজকুমার সিদ্ধার্থ চতুর্থ দিনে আবার সারথিকে সঙ্গে নিয়ে উদ্যান ভ্রমণে বের হলেন। তবে রাজকুমারের মন ছিল ভারাক্রান্ত কারণ তাঁর চিন্তায় শুধু মনে হয়েছিলো যে, আবার কি দৃষ্ট হয়? আবারও দেবতাদের প্রভাবে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল একজন সন্ন্যাসী। রাজকুমার সিদ্ধার্থ দেখলেন যে, তাঁর সামনে শান্ত-দান্ত, সংযত ব্রহ্মাচারী ভিক্ষুকে, তাঁর অঙ্গে কাষার বসন, মুখমন্ডল প্রসন্ন, অঙ্গে দিব্যজ্যোতি, করুণায় অন্তর পরিপূর্ণ। রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন- ‘‘সৌম্য কে এই পুরুষ?’’ সারথি সন্ন্যাস বিষয়ে অবগত ছিলনা। কিন্তু দেবতাদের দৈবশক্তির প্রভাবে সারথি উত্তর দিয়ে বলল- ‘‘উনি একজন সংসারত্যাগী প্রব্রজ্জিত পুরুষ। উনি কামসুখ উপেক্ষা করে বিনীত আচার অবলম্বন করেছেন। সংসারে ভোগ-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়কে সুসংযত করে পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছেন। তিনি লোভ, দ্বেষ ও মোহাবরণ ছিন্ন করে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করেন এবং সকল জীবকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।’’ সারথির কথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ আশ্বস্ত হয়ে বললেন-

সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্যা নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতং চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলং চ ॥[৪]

সারথি যে বিষয়ের কথা বলল- রাজকুমার সিদ্ধার্থের তা অত্যন্ত পছন্দ হল। তিনি এসব বাক্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। জ্ঞানীগণ সবসময়ই প্রব্রজ্যার প্রশংসা করেছেন। আশ্রমে অবস্থান করে নিজের হিত ও পরহিত সাধন করতে পারা যায় এবং সুখী জীবন যাপন করতে পারা যায়। সুমধুর অমৃতফল অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।[৫]

সন্ন্যাসীকে দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মন প্রসন্ন হল। ‘‘সন্ন্যাসের পথ দুঃখ মুক্তির পথ, আমাকে এই পথেই চলতে হবে-’’ এই কথা ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থ উদ্যানভূমিতে গমন করলেন। তিনি উদ্যানভূমিতে

মহানন্দে সারাদিন অতিবাহিত করে সুসজ্জিত রথে আরোহণ করে প্রাসাদাভিমুখে রওনা হলেন। এমন সময় রাজা শুদ্ধোদন জানতে পারলেন যে, পুত্রবধূ গোপা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। সংবাদ শুনেই সাথে সাথে তিনি তাঁর পুত্রের কাছে শুভ সংবাদ পাঠালেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই সংবাদ শুনে বললেন- ''রাহুলো জাতো, বন্ধনং জাতং''- রাহুলের জন্ম হয়েছে, বন্ধনেরই জন্ম হয়েছে।[৬] উদ্যান থেকে প্রাসাদে ফেরার সময় সিদ্ধার্থের দূরসম্পর্কীয় বোন কৃশাগৌতমীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। কৃশা গৌতমী রাজকুমারের দেহ-সৌন্দর্য, সৌভাগ্য ও বিপুল সম্পদ দর্শন করে প্রীতির আতিশয্যে নিম্নোক্ত গাথা উচ্চারণ করেন।

'নিব্বুতা নুন সা মাতা,
নিব্বুতা নুন সো পিতা,
নিব্বুতা নুন সা নারী,
যস্সায়ং ইদিসো পতি।'[৭]

অবশ্য নিবৃত্ত সেই জননী হৃদয়
সর্বলোকে ধন্য সেই পিতৃ পরিচয়,
এহেন পুরুষ পতি সেই ললনার
জীবন তাঁর ধন্য ধরণী মাঝার।[৮]

অর্থাৎ এরূপ পুত্র লাভে মাতৃহৃদয় নিবৃত্ত বা নির্বাপিত হয়। এরূপ পুত্র লাভে পিতৃ হৃদয় নির্বাপিত হয়। এরূপ স্বামী লাভে নারী হৃদয়ও নির্বাপিত হয়। শাক্য কুমারী কৃশা গৌতমীর মুখে উচ্চারিত গাথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভাবলেন- ''রূপ ও সৌন্দর্যে পিতা মাতার হৃদয় নিবৃত্ত বা তৃপ্ত হয়, স্ত্রীর হৃদয় নিবৃত্ত বা প্রাপ্তির পরিপূর্ণতায় ভরে উঠে। কিন্তু এই আনন্দ বা সুখ ক্ষণস্থায়ী, এতে দুঃখের নিবৃত্তি হয়না। একমাত্র বাসনার নিবৃত্তিতেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও নির্বাণ লাভ হয়। যে পথে দুঃখের প্রকৃত নিবৃত্তি হবে, আমি সে পথের অনুসন্ধান করবো।" কৃশা গৌতমীর এরূপ ভাবোচ্ছ্বাস গাথা শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ আরও চিন্তা করলেন- নির্বাপিত হলে হৃদয়ও নিবৃত্ত হয়। 'নিব্বুত' শব্দটি রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে 'নির্বাণ' এর ভাব এনে দিল। শাক্যকুমারীর ভাবোচ্ছ্বাসে গভীর তত্ত্ব 'নির্বাণ' এর অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর কণ্ঠ থেকে লক্ষ টাকা মূল্যের মুক্তাহার খুলে দক্ষিণা স্বরূপ দান করে দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

MnZ¨vM

সিদ্ধার্থের[৯] গৃহত্যাগ প্রসঙ্গে অনেক কল্পিত গল্পের সূত্রপাত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সিদ্ধার্থ কাউকে না জানিয়ে প্রিয়জনের অলক্ষ্যে কপিলাবস্তুর রাজপুরী ত্যাগ করেছিলেন। তবে ধারণা করা হয় যে, এই কাহিনী ভিত্তিহীন, কাল্পনিক, কারণ রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজেই তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে-

"মাতা পিতা যদিও বিরোধী ছিলেন
যদিও তারা অশ্রুসিক্ত হয়ে ক্রন্দন
করেছিলেন, তবুও আমি কেশ শ্মশ্রু
ছেদন করে অগৃহীরূপে
প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছিলাম।"

দেবতাদের প্রভাবে রাজকুমার সিদ্ধার্থ চার নিমিত্ত[১০] দর্শন করে স্থির থাকতে পারলেন না। মনের আবেগে সংসার ধর্ম ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন। একদিন রাজ-অন্তঃপুরে সকলেই নিদ্রিত। একমাত্র রাজকুমার সিদ্ধার্থই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী গোপা স্বপ্নে দেখলেন, রাজপুরী অন্ধকার করে এক জ্যোতিপিন্ড নগর দ্বার দিয়ে বের হচ্ছে। আতঙ্কে গোপার প্রাণ কম্পিত হয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দন করে বলে উঠলেন-''কহ, প্রাণনাথ, একি নিদারুণ স্বপ্ন দেখলাম। আমি অনেক ভীত হয়েছি, দয়া করে বলুন আমার স্বপ্নের কথা।" রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রাণপ্রিয় স্ত্রী গোপাকে আশ্বাস প্রদান করে বললেন-"প্রাণপ্রিয়ে গোপা! এটা তোমার দুঃস্বপ্ন নয়। তুমি পুণ্যবতী, তাই পুণ্যময় পরম পবিত্র স্বপ্ন দেখেছ। প্রিয়ে, এ রাজপুরী হতে যে প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিপিন্ড বের হতে দেখেছ, সে জলন্ত জ্যোতিঃপিন্ড জীব-জগতের মহান্ধকার দূর করে জগতে এক দিব্যালোক প্রদায়ী স্বর্গীয় ভূষণে বিভূষিত করবে। আমরা তাতে ভূষিত হয়ে পরম প্রীতলাভ করব। গোপা ভীত না হয়ে বরং আনন্দিত হও, ধৈর্য ধর, শোক ত্যাগ কর, সুখের সন্ধানে মন নিয়োজিত কর। মহাসুখে সুখী হবে।" রাজকুমারের কথা শুনে গোপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর প্রাসাদে সর্বাভরণে প্রতিমন্ডিতা নৃত্যগীতে সুনিপুণা দেবকন্যা সদৃশ সুদর্শনা নর্তকীবৃন্দ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদি গ্রহণ করে পালাক্রমে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মাধ্যমে কুমার সিদ্ধার্থের মনোরঞ্জনে তৎপর হল। কিন্তু সিদ্ধার্থ কিছুতেই নৃত্যগীতে রমিত হলনা। তাঁর মন পরম

প্রশান্তিতে ভরপুর। তিনি গৃহত্যাগ করে নিবৃত্তির সন্ধানে বের হবেন-এই সংকল্পে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। তিনি এসব ভাবতে ভাবতেই মুহূর্তের মধ্যেই নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিদ্রিত হলে নর্তকীবৃন্দও একে একে নিদ্রাভিভূত হল।

রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। পরিশ্রান্ত নর্তকীবৃন্দ যার যার বাদ্য-যন্ত্র-নৃত্য-গীত ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অতঃপর কুমার সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি বলে উঠলেন- ''একি দৃশ্য! গভীর রাত্রি, নিদ্রিতা নর্তকীবৃন্দ কেউ বিবস্ত্রা, কেউ অর্ধবস্ত্রা, কারো বিচ্ছিন্ন কবরী, কারো বদন কেশজালে সমাচ্ছন্ন, কারো বদন বিকৃত ও বিকট ভঙ্গী, ঘৃণিত নয়ন, কারো ভীতিপূর্ণ বিকট হাস্য, মুখে কদর্ব প্রলাপ, দন্তে দন্তে সংঘর্ষ, লালা নিঃসৃত হচ্ছে এবং ভীতিপূর্ণ নাসিকার শব্দে প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত। কি কুৎসিত কদর্য ঘৃণিত দৃশ্য! যে নারীর রূপলাবণ্যে অপরূপ সৌন্দর্যে এইমাত্র কক্ষ আলোকিত ও অভূতপূর্ব শোভা ধারণ করে মনপ্রাণকে বিমোহিত করেছিল, তৎমুহূর্তের সে সৌন্দর্য্যের কী কুৎসিত পরিণাম! কী শোচনীয় জঘণ্য দৃশ্য?[১১] পতঙ্গ যেমন মনের আনন্দে হাসতে হাসতে অগ্নিতে আহূতি দিয়ে পুড়ে ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ মানুষও কামানলে প্রতিনিয়ত পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হচ্ছে। মোহাবরণে আচ্ছন্ন মানুষ জগতের এ দৃশ্য দেখেও তা উন্মোচন করতে পারছেনা। আমি সেই মোহাবরণ ছিন্ন করে মহাসত্যের সন্ধানে গমন করব।'' এই সকল বীভৎস দৃশ্য দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে কামনা-বাসনা, ভোগ-বিলাসের প্রতি আরো তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হল। তাঁর কণ্ঠে করুণ সুর ধ্বনিত হল- 'উপদ্দুতং বত ভো! উপস্সট্ঠং বত ভো!''- অর্থাৎ এ সংসার বড়ই উপদ্রবপূর্ণ ও অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। অতঃপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভাবলেন- বৃদ্ধ মাতা পিতার অজ্ঞাতে যদি গৃহত্যাগ করি, তাহলে তাদের করুণ হৃদয়ে নিদারুণ শেলাঘাত করা হবে। সুতরাং আমি পিতার চরণে প্রণত হয়ে চিরবিদায় নিয়ে বাঞ্ছিত পথের সন্ধানে গমন করব। একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ পিতার অলক্ষ্যে কক্ষে প্রবেশ করে পিতার পদতলে পতিত হলেন। মহারাজ শুদ্ধোদন দেখলেন, শান্ত ধীর স্থির পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেবপ্রভায় কক্ষ আলোকিত করে পদতলে পতিত পুত্র সিদ্ধার্থ পিতার চরণদ্বয় ধরে বললেন- ''পিতঃ! কোন খেদ বা শোক করবেন না। বাধা দেবেন না আমার কর্তব্য পথে। হে পিতঃ! আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার মহাভিনিষ্ক্রমণ কাল সমাগত। আশীর্বাদ করবেন, যাতে আমার মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং সিদ্ধার্থ নামের সার্থকতা আমি যাতে অর্জন করতে পারি।''

ভূপতি পুত্রের হৃদয় বিদারক কথা শুনে মুর্ছিত হয়ে ধরায় লুটিয়ে পড়ার সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থ ধরে ফেললেন। মহারাজ হৃদয় বিদীর্ণ আঘাত সংবরণ করে পুত্রকে বললেন- ''কহ বৎস! কোন্ অভাবে

সংসার ত্যাগ করতে চাও? রূপ লাবণ্যময়ী স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশ বধূমাতা, নবোদিত শশধর সদৃশ শিশুপুত্র, সবিস্তীর্ণ প্রকৃতির চারুলীলা ভূমি শাক্যরাজ্য, অনুপম রূপ যৌবনসম্পন্ন সুকোমল তোমার দেহ। এই দেহ-মন নিয়ে কিভাবে কঠোর সন্ন্যাসব্রতের নিদারুণ দুঃখ সহ্য করবে। হায়! প্রাণাধিক পুত্র! তোমাকে পেয়ে তোমার মাতার শোক ভুলেছি। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি একমাত্র নয়নের মণি। আমি এখন জরা-জীর্ণ। এই জরা-জীর্ণ তরীকে অকুল সাগরে ভাসিয়ে দিওনা।'' একথা বলতেই শোক-দুঃখে ভূপতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল এবং তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বৃদ্ধ পিতার মানসিক অবস্থা দেখে পুত্র সিদ্ধার্থেরও নয়ন অশ্রুসিক্ত হল। রাজা শোকাবেগ সংবরণ করে বললেন- ''বৎস! তোমার কি দুঃখ? কিসের অভাব? কেন তুমি সংসার ছেড়ে যেতে চাও? বল তুমি কি চাও? তুমি যা প্রত্যাশা কর তা আমি অকাতরে অম্লান বদনে তোমাকে দেব। হায়! প্রাণাধিক পুত্র, এ অথর্ব রাজার প্রতি, রাজ্যের প্রতি, রাজপুরবাসীগণের প্রতি দয়া কর। অকালে সংসার ত্যাগ করে শাক্যরাজ্যকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে দিওনা।''

এই কাতরোক্তি শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন- ''পিতঃ! এই দাসকে দয়া করে চারটি বর প্রদান করলে আমি আর সংসার ত্যাগ করব না। সেগুলো নিম্নরূপ-

১) আমার যৌবনকে যেন জরা, বার্ধক্য কখনই গ্রাস করতে না পারে।
২) আমি যেন কখনই কোন ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত না হই।
৩) মৃত্যু যেন আমার জীবন হরণ করতে না পারে।
৪) যে সম্পদ অক্ষয় অব্যয় আমি যেন তা লাভ করি।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের আবেদন শুনে মহারাজ শুদ্ধোদন বিষাদের সাথে বললেন- 'হায় বৎস! যা পাওয়ার নয়, যা দেওয়ার নয়, তা বলে আমাকে নিছক বিভ্রান্ত করছ মাত্র। যা কঠোর তপস্যায় বা মহাধ্যানে যোগীরাও লাভ করতে পারেনা, তা আমি তোমাকে কি করে দেব?'' রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- "পিতঃ! তাহলে আমাকে অন্য একটি বর দিন, আমি গৃহত্যাগ করলে আপনি ও মাতা চোখের অশ্রু বিসর্জন দিবেন না, শোকে কাতর হবেন না। পিতঃ! যে গৃহে আগুন ধরেছে, সে হতে যদি কেউ বের হতে চায় আপনার তাকে বাধা দেওয়া কি উচিত হবে?'' রাজকুমার সিদ্ধার্থের কথা শুনে মহারাজ শুদ্ধোদন বুঝতে পারলেন যে, তার সন্মুখে তার পুত্ররূপী বোধিসত্ত্ব। মহারাজের কি সাধ্য তার গতি রোধ করেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যে শান্তিময় রাজ্যের অভিলাষী, তার তুলনায় এই শাক্যরাজ্য অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি হেয়। মহারাজ মনে করলেন- ''আমি কেন বৃদ্ধ বয়সে মানবের মুক্তিপথের কন্টক হব?'' এই কথা

ভেবে বিদীর্ণ হৃদয়ে মহারাজ নিজ পুত্রের মায়াপাশ ছিন্ন করে, করুণ স্বরে বললেন- ''বৎস! তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক!'' তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ তার দুই হাত দিয়ে রাজা শুদ্ধোদনের দুই পা স্পর্শ করল এবং মহারাজ শুদ্ধোদন তার দুটি হাত পুত্রের মাথার উপর রাখল আর উভয়ের চোখেই শোকাশ্রু অবিরল প্রবাহিত হচ্ছে। জগতের এ কী বিচিত্র মহিমা! যে মুহূর্তে পিতা-পুত্রের মধুর মিলন, তৎমুহূর্তে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদ-বিয়োগ। এই বিদায়কালীন করুণ দৃশ্যে কার অন্তর ব্যথিত না হয়। এটা অনন্ত প্রাণী জগতে যোগ-বিয়োগের খেলা মাত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থ পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপন প্রাসাদে চলে গেলেন। বৃদ্ধ পিতা নিস্তব্ধ কক্ষে বজ্রাহতের ন্যায় পড়ে রইলেন।

শান্ত প্রকৃতি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অন্তরীক্ষ। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বিদায়কালে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী গোপাও নবজাত পুত্রকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য গোপার কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষের মধ্যে সুগন্ধী তেলের দীপ জ্বলছে শান্ত আলোক শিখা। সেই দীপালোকে তিনি দেখতে পেলেন- মল্লিকাকুসুমাকীর্ণ শয্যায় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী গোপা এবং নবজাত পুত্র রাহুল নিদ্রিত আর স্ত্রী গোপার হাত তার পুত্রের শিরোপরে ন্যস্ত। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই দৃশ্য অবলোকন করে ভাবলেন- ''যদি আমি পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করি তাহলে তার মা জেগে যেতে পারে। এতে আমার গৃহত্যাগে বাধা আসবে। অতএব বুদ্ধত্ব লাভ করার পরে এসে পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ করব।''[১২] তাই তিনি আত্মসংবরণ করে ধীর পায়ে গোপার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন।

রাজ-অন্তঃপুর থেকে বের হয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে ডেকে তুললেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে বললেন-"ছন্দক! আমার কণ্ঠক অশ্বকে সজ্জিত করে শীঘ্রই নিয়ে এসো। সময় একেবারে আগত।" একথা শুনে ছন্দকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। ছন্দক বিস্মিত হয়ে বললেন- "যুবরাজ! আপনি এই নীরব নিশীথ রাতে কোথায় যাবেন? রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর স্বরে বললেন- "ছন্দক! আমি আজন্ম যে পিপাসায় পিপাসিত, তা নিরোধ করতে, জরা-ব্যাধি মৃত্যুরূপ দুঃখের অবসান করতে, জগতে সত্য, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাব।'' রাজবাড়ীর আঙ্গিনা পেরোতেই প্রিয়তমা স্ত্রী ও প্রিয় পুত্র রাহুলের কথা বার বার মনে পড়ছে রাজকুমার সিদ্ধার্থের। আর তা চলচ্চিত্রের মতো ক্রমান্বয়ে ভেসে উঠছে রাজকুমার সিদ্ধার্থের স্মৃতিপটে।

রাজপ্রাসাদের নীচে সারথি ছন্দক কণ্ঠককে নিয়ে অপেক্ষমান রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্য। রাজকুমার সিদ্ধার্থ কণ্ঠকের কাছে এসে বললেন- ''প্রিয় কণ্ঠক, আজ রাতে তুমি শুধু একবার আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। আমার সাধনার সংকল্প পথে তুমি আমার সহায়ক হও।'' এই বলে তিনি এক লাফ দিয়ে কণ্ঠকপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। দৈহিক আকৃতিতে অশ্বরাজ কণ্ঠক গ্রীবাদেশ হতে আঠার হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট, তদনুপাতে উচ্চতাসম্পন্ন অসীম বলশালী, সুতীব্র বেগবান এবং পরিচ্ছন্ন শঙ্খসদৃশ সুশুভ্র দেহযুক্ত ছিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ কণ্ঠকপৃষ্ঠে আরোহণ করা মাত্র সে বিদ্যুদ্বেগে ধাবমান হতে শুরু করল কিন্তু দৈব শক্তিতে অশ্বের ক্ষুরশব্দ শ্রুত হলনা। সিদ্ধার্থ নগরের প্রধান তোরণের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি যাতে ইচ্ছামত নগরদ্বার উন্মুক্ত করতে না পারেন সেজন্য তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদন নগরদ্বার এমনভাবে প্রস্তুত করেছিলেন যাতে দরজার প্রতিটি কপাট খুলতে সহস্র পুরুষের প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাজকুমার সিদ্ধার্থ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবলেন-"যদি আজ নগরদ্বার উন্মুক্ত না হয় তাহলে ছন্দক সহ কণ্ঠকের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমি উভয় উরু দিয়ে কণ্ঠককে চেপে ধরে আঠার হাত উচ্চ এই প্রাচীর এক লাফে অতিক্রম করব।" অন্যদিকে সারথি ছন্দকও একই কথা ভাবল। কিন্তু দ্বার-রক্ষক দেবতা নগরের সিংহদ্বার খুলে দিল। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা।[১৩] রাজকীয় ঠাটবাট, সুখ-সম্ভোগ, আত্মীয়-পরিজন, মাতা-পিতা, প্রাণপ্রিয় স্ত্রী গোপাদেবী, সদ্যজাত পুত্র রাহুলের স্নেহজাল ছিন্ন করে জগত সংসারের দুঃখ মুক্তির জন্য নিশীথ রাতে রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে নগর থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন। বৌদ্ধ জগতে এটা 'মহাভিনিষ্ক্রিমণ' নামে অভিহিত হয়। মাতৃকুক্ষি থেকে ভূমিষ্ট হওয়া থেকে ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে নগরে তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনের অধিক কাল কেটেছে, সেই কপিলাবস্তু নগর ত্যাগ করে শাক্যরাজ্যের সীমানা পার হয়ে অজ্ঞাত পৃথিবীর পথে পা রাখলেন। আর পিছনে পড়ে রইল শোকাকুল রাজপ্রাসাদ, শোকাকুল কপিলাবস্তু। ঠিক এই মুহূর্তে অন্তরীক্ষ থেকে দুটি 'মার' এসে রাজকুমার সিদ্ধার্থকে বলল- "মহাশয়, নিষ্ক্রান্ত হবেন না, সংসার ত্যাগ করবেন না। আজ থেকে সাতদিন পর আপনার কাছে 'চক্ররত্ন' আবির্ভূত হবে। আপনি সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হবেন। অতএব ক্ষান্ত হোন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন।"[১৪] রাজকুমার সিদ্ধার্থ মারের পরিচয় পেয়ে বললেন- "আমার চক্ররত্ন আবির্ভাবের কথা আমি জানি। কিন্তু রাজচক্রবর্তীত্ব আমার কাম্য নয়। আমি দশ সহস্র চক্রবাল হর্ষধ্বনি প্রতিধ্বনিত করে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হব।" তখন মার বলল- "হে গৌতম, আমি চিরদিন ছায়ার ন্যায় তোমাকে অনুসরণ করব এবং সুযোগ পেলেই জব্দ করব"- এই বলে প্রস্থান করল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু নগরের মঙ্গলদ্বার বিনা বাধায় অতিক্রম করলেন। সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে (খ্রী: পূ: ৫৯৫ বা ৫৩৪ অব্দ) আকাশে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রসহ পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান ছিল। তিনি শেষ বারের মতো জন্মভূমি অবলোকনের জন্য দাঁড়ালেন। পরবর্তীকালে এই স্থানটি ''কন্থক-নিবর্তন চৈত্য'' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহাভিনিষ্ক্রমণে তিনি অতুলনীয় সম্মান, মহান ঔদার্য ও পরম শ্রীসৌভাগ্যের সাথে ক্রমশ সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর মহাভিনিষ্ক্রমণে দেবগণ পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে ষাট হাজার আলোকবর্তিকা ধারণ করেছিল এবং অপর দেবগণ চক্রবালের প্রান্তসীমায় অসংখ্য আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘন মেঘাবৃত অন্তরীক্ষ হতে মুষল ধারে বারি বর্ষণের ন্যায় স্বর্গীয় পরিজাত ও মন্দার পুষ্পে সমগ্র আকাশ ও পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এভাবে জাঁকজমকপূর্ণ সম্মানের সাথে চলতে চলতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ তিন রাজ্য অতিক্রম করে ত্রিশ যোজন দূরে 'অনোমা'[১৫] নামক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সারথি ছন্দককে জিজ্ঞেস করলেন- "ছন্দক, এই নদীটির নাম কি?" সারথি ছন্দক উত্তর দিল-"প্রভু, এই নদীর নাম অনোমা।" সারথি ছন্দকের মুখে 'অনোমা' নাম শুনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- "তবে, আমার প্রব্রজ্যাও অনোমা (=শ্রেষ্ঠ) নামে অভিহিত হোক।" এই বলে তিনি অশ্ব কণ্ঠককে গুল্‌ফ দিয়ে আঘাত করে নদী অতিক্রমের সঙ্কেত দিলে সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুভক্ত অশ্ব কণ্ঠক এক লাফে অষ্ট-উসভ[১৬] বিস্তৃত সেই নদী অতিক্রম করে অপর তীরে অবতীর্ণ হল। তারপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে সারথি ছন্দককে বললেন- ''ভাই ছন্দক, তুমি অশ্বরাজ কণ্ঠক এবং আমার আভরণ সমূহ নিয়ে কপিলাবস্তু নগরে ফিরে যাও, আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করব।'' সারথি ছন্দক বলল ''প্রভু, আমিও আপনার সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।'' রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''তুমি প্রব্রজ্যা জীবনযাপন করতে পারবে না, নগরে ফিরে যাও।'' এভাবে রাজকুমার সিদ্ধার্থ পরপর তিনবার সারথি ছন্দকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে রাজকীয় আভরণসমূহ ও অশ্ব কণ্ঠকের দায়িত্বভার তার উপর ন্যস্ত করলেন।[১৭]

অতঃপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজেই চিন্তা করলেন- ''আমার মস্তকে সুবিন্যস্ত এই দীর্ঘ কেশকলাপ প্রব্রজিত জীবনের পক্ষে শোভনীয় নয়। অতএব আমার সুদীর্ঘ কেশদাম নিজের অস্ত্রের সাহায্যে নিজেই ছেদন করব।'' এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি দক্ষিণ হাতে অসি ও বাম হাতে রাজমুকুট সহ কেশকলাপ ধারণ করে নিজেই তা কর্তন করলেন এবং আকাশে উড়িয়ে দিয়ে সত্যক্রিয়া করলেন।[১৮] তিনি বললেন- ''যদি সত্য সত্যই আমি ইহজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করি তাহলে এই মুকুট ও কেশদাম উর্দ্ধাকাশে স্থিত থাকবে,

ভূমিতে পতিত হবেনা।'' সারথি ছন্দক বিস্মিত হয়ে দেখল যে, রাজকুমার সিদ্ধার্থের রত্নখচিত মুকুট ও কেশদাম আকাশে স্থিত হয়ে আছে। অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র তা হাতে ধারণ করে স্বর্ণপাত্রে রেখে দিলেন।

সুরক্ষিত কেশচূড়া করিয়া ছেদন
মহাসত্ত্ব নভোপানে করিয়া ক্ষেপণ।
দেবরাজ সেই বেশ স্বর্ণপাত্রে ধরি
রক্ষা করে আপনার মস্তক উপরি।[১৯]

কেশ ছেদন করার পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভাবলেন- ''এই কৌশিক বস্ত্র সন্ন্যাস জীবনের পক্ষে অনুকূল নয়।'' রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনের ভাব জানতে পেরে শুদ্ধাবাসকায়িক দেবগণ চিন্তা করলেন- ''রাজকুমার সিদ্ধার্থের কাষায়বস্ত্র প্রয়োজন।'' তৎপর একজন দেবতা ব্যাধের ছদ্মবেশে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''সৌম্য, তোমার কাষায় বস্ত্র আমাকে দিলে আমার কৌশিক সুকোমল বস্ত্র তোমাকে দিব।'' অতঃপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ এক ব্যাধের সাথে নিজের বহুমূল্যের বসন বিনিময় করে ব্যাধের কাষায় বস্ত্র পরিধান করলেন।[২০] এতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কাষায় বস্ত্রধারী হলেন এবং ছদ্মবেশী দেবতা রাজকুমার সিদ্ধার্থের কৌশিক সুকোমল বস্ত্র দুই হাতে ধারণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।[২১] সারথি ছন্দক অশ্রুসিক্ত নয়নে সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসবেশের অপূর্ব শোভা দেখল। অশ্ব কণ্ঠকও প্রভুর সন্ন্যাসবেশ দেখে নয়ন বারি বর্ষণ করতে লাগল। তারপর অশ্ব কণ্ঠকের গ্রীবা আলিঙ্গণ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''যাও কণ্ঠক, ক্রন্দন করোনা। ঘরে ফিরে যাও। তুমি তোমার প্রভুর মহৎ কার্য সাধনে সহায়তা করেছ।'' সারথি ছন্দককেও রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- ''যাও ভাই ছন্দক, এখন তুমি নগরে ফিরে যাও। নগরে ফিরে আমার পিতামাতাকে আমার নিরাময় সংবাদ জ্ঞাপন করবে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দক ও অশ্ব কণ্ঠককে রাজবেশ সহ অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন। আর তিনি জগতের ক্লেশ নিবারণের জন্য বেছে নিলেন কঠোর পরিভ্রমণের বাসনা। অন্য দিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ দৃষ্টির অন্তরাল হওয়ামাত্র প্রভুভক্ত কণ্ঠক শোকের বেগ সহ্য করতে না পেরে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করল। অশ্ব কণ্ঠকের মৃত্যুতে সারথি ছন্দকের শোক-যন্ত্রণা দ্বিগুণ হল এবং এতে সে অত্যধিক রোদন ও পরিবেদনা করল।[২২]

সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। পথ চলতে চলতে তিনি প্রথমে বৈরত ঋষির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করলেন। পরে তিনি আরো দু'জন ঋষির আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, এক এক আশ্রমের সাধুগণ এক এক পদ্ধতিতে সাধনায় রত। তাঁদের সকলের অভীষ্ট লক্ষ্য হল স্বর্গলাভ। তিনি জানতে পারলেন, বৈশালীতে আরাড় কালাম[২৩] নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি বাস করেন। তাঁর তিনশত শিষ্য আছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ এই কঠোর তপস্বীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই সন্ন্যাসীর অনুসরণে তিনি দীর্ঘদিন আধ্যাত্ম শিক্ষা, অতি কঠোর আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করলেন। তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর জ্ঞাত সকল বিদ্যা আয়ত্ত্ব করেন। কিন্তু আরাড় কালামের সন্ন্যাসের শিক্ষা সিদ্ধার্থকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারলনা। রাজকুমার সিদ্ধার্থ আরাড় কালাম সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ভাগীরথীর রমণীয় উপত্যকায় পঞ্চপর্বত বেষ্টিত মগধের রাজধানী রাজগৃহ সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। এই নগরের পূর্বদিকের পাহাড়ের নাম রত্নগিরি। এই রত্নগিরি পাহাড়ের মনোরম বিজন পরিবেশে ছিল বহু সুরক্ষিত গুহা। এই পাহাড় বাইরের কোলাহল থেকে মুক্ত এবং প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, অন্যদিকে নগরীর সমীপবর্তী হওয়ায় ভিক্ষা সংগ্রহের সুবিধার কারণে এই গুহাগুলোতে বহু সন্ন্যাসী বাস করতেন। রাজগৃহের এই পাহাড় হয়ে উঠেছিল অসংখ্য সাধুর সাধনক্ষেত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থও পান্ডবশৈলের[২৪] এক নির্জন গুহায় আশ্রয় নিলেন। নগরের রাজপথে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হওয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্য ও তাঁর শান্ত সৌম্য সংযত আচরণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতি দ্রুত নগরের সর্বত্র এই দিব্যকান্তি নবীন সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কল্প কাহিনীও প্রকাশ পেতে থাকে। একসময় রাজা বিম্বিসারের নিকট এই নতুন সন্ন্যাসীর কথা পৌঁছে গেল। রাজা বিম্বিসার সন্ন্যাসীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য প্রাসাদ থেকে রথে চড়ে রওনা হলেন। পান্ডবশৈলীর পথেই সন্ন্যাসীর সাথে রাজা বিম্বিসারের দেখা হল। রাজা সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন। রাজা বললেন, "আমার মৃত্যুর পর আপনি মগধের রাজা হবেন।" সন্ন্যাসী গৌতম বিনয়ের সাথে রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি রাজাকে বললেন, "ভোগে সুখ নেই, তাই আমি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে প্রকৃত সুখ বা সত্যের সন্ধানে বের হয়েছি, এই সত্যের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এটাই আমার পথ। কোনদিন সত্যজ্ঞানের সন্ধান পেলে আপনার সাথে আমি আবার সাক্ষাৎ করব"– এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি পান্ডবশৈলী ত্যাগ করলেন।

তৎকালীন সময়ে রাজগৃহ অঞ্চলে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন রামপুত্র রুদ্রক। রুদ্রক ছিলেন বহু শাস্ত্রজ্ঞ, অতি উঁচু স্তরের সাধক। তাঁর সাতশত শিষ্য ছিল। রাজকুমার গৌতম তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছে ধর্মশিক্ষা ও ধ্যানানুশীলন চালিয়ে যেতে থাকেন। সাধক রামপুত্র রুদ্রকের সাথে কিছুকাল

ধর্মচর্চা করে তিনি গুরুর সমকক্ষতা অর্জন করেন। তিনি লক্ষ্য করলেন; গুরুর শিক্ষা ও সাধন-প্রণালী অনেক উঁচু স্তরের হলেও তা দ্বারা সত্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তখন তিনি অন্য পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবতে লাগলেন। অতঃপর তিনি রাজগৃহ ত্যাগ করে গয়াশীর্ষ হয়ে উরুবিল্বে পৌঁছেন। এই সময় গুরু আরাড় কালামের তিন শিষ্য কৌন্ডিণ্য, বপ্প ও অশ্বজিৎ এবং গুরু রামপুত্র রুদ্রকের দুই শিষ্য মহানাম ও ভদ্দিয় তাঁর সাথে যোগ দেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতাসাধনের মাধ্যমে দৈবশক্তি ও অন্তদৃষ্টি লাভ করা যায়। আরাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের মত গুরুর কাছে দর্শন শিক্ষা করেও যখন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেন না তখন সিদ্ধার্থ গৌতম মনস্থ করলেন– কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছতা সাধনের প্রাচীন প্রচলিত পন্থাই তিনি অনুসরণ করবেন। এরপর রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজর্ষি গয়ের নগরী নামক আশ্রমে কিয়ৎকলে অবস্থান করলেন। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের পর তিনি উরুবিল্ব প্রদেশের সেনানী গ্রামে[২৫] এসে উপস্থিত হলেন। এই স্থান সম্বন্ধে কুমার সিদ্ধার্থ নিজে বর্ণনা দিয়েছেন– "এই তো সেই রমনীয় ভূভাগ এবং মনোরম বনখন্ড, অদূরে স্বচ্ছসলিলা সুতীর্থ যুক্তা প্রবাহমান নদী এবং চতুর্দিকে রমনীয় গোচর গ্রাম। সাধনা-প্রয়াসী কুলপুত্রের পক্ষে এটাই তো সাধনার স্থান! এটা ভেবে তিনি বললেন, হে ভিক্ষুগণ, সাধনার জন্য এই স্থান পর্যাপ্ত বলে মনে করে এই স্থানেই আমি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হই।"[২৬]

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেনানী গ্রামের নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হলে তাঁর প্রতি তিনটি অশ্রুতপূর্ব অত্যাশ্চর্য উপমা প্রতিভাত হয়।

c_g Dcgv: যার কাম্যবস্তু বিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয়নি তিনি কখনই আন্তরিক শারীরিক দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে আর্দ্র কাষ্ঠ জলের মধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণি দিয়ে সংঘর্ষণ করেন, তাহলে তিনি তা হতে অগ্নি উৎপাদন করতে পারবেননা। সেরূপ যার চিত্ত রাগাদি দিয়ে আর্দ্র রয়েছে, তিনি জ্ঞানজ্যোতি লাভ করতে পারবেননা। এই উপমা রাজকুমার সিদ্ধার্থের চিত্তে প্রথম উদিত হয়।

wØZxq Dcgv: যিনি আর্দ্র কাষ্ঠ নিয়ে স্থলে সংস্থাপন করে আর্দ্র অরণি দিয়ে তা সংঘর্ষণ করেন, তিনিও সেটা হতে অগ্নি উৎপাদন করতে সমর্থ হননা। সেরূপ যাদের মন রাগাদি অভিষিক্ত তারাও জ্ঞানজ্যোতি লাভ করতে পারেননা। এটা হল দ্বিতীয় উপমা।

ZZxq Dcgv: যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ নিয়ে স্থলে সংস্থাপন করে শুষ্ক অরণি দিয়ে তা সংঘর্ষণ করেন, তিনি তা হতে অগ্নি উৎপাদন করতে পারেন। সেরূপ যার চিত্ত হতে রাগাদি ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছে, তিনিই একমাত্র জ্ঞানাগ্নি লাভ করতে সমর্থ। এটা হল রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে ধারণকৃত তৃতীয় উপমা।[২৭]

তৃতীয় উপমার মাধ্যমে রাজকুমার সিদ্ধার্থের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হল যে, যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কাম্যবস্তু হতে বিচ্যুত হয়ে অবস্থান করেন এবং তাঁদের মধ্যে কামচ্ছন্দ, কামস্নেহ, কামমূর্চ্ছা, কাম-পিপাসা বা কাম-পরিদাহ বলতে যা কিছু তা আধ্যাত্মে সুপরিক্ষীণ, সুপ্রশমিত হয়, সাধনাপ্রয়াসে তাঁরা তীব্র-তীক্ষ্ম ও কঠোর দুঃখবেদনা অনুভব করলেও তাঁদের পক্ষে জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ সম্ভব হয়।[২৮] তিনি ভাবলেন, আরাড় কালাম এবং রামপুত্র রুদ্রকের কথা যাঁরা বলেছিলেন যে, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাবলের দ্বারা বলীয়ান হলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নয়। আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজে জানেন যে, তিনি শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান। তিনি আরো জানেন যে, তিনি কামনা-বাসনামুক্ত এবং তিনি কোন প্রকার তীব্র কঠোর দুঃখ বেদনা অনুভব করতেও প্রস্তুত। অতএব, তাঁর কেন জ্ঞানদর্শন ও অনুত্তর সম্বোধি লাভ করা সম্ভব হবেনা?- এই চিন্তা করে তিনি ষড়বর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ প্রথমে দন্তে দন্ত চেপে, জিহ্বা দিয়ে তালু স্পর্শ করে, চিত্ত দিয়ে চিত্তকে অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করলেন– যেমন কোন বলবান পুরুষ দুর্বল পুরুষকে শিরে কিংবা ঘাড়ে ধরে অভিনিগৃহীত, অভিনিপীড়িত ও অভিসন্তপ্ত করে। এটা দিয়ে তাঁর বীর্য আরব্ধ হয় যা শিথিল হওয়ার নয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় যা সংমূঢ় হওয়ার নয় কিন্তু তাঁর দুঃখ-বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্তই থেকে যায়। তারপরও সেই দুঃখ–বেদনা তাঁর চিত্তকে অধিকার করতে পারে নেই।[২৯]

পরে তিনি মুখ ও নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করেন। এতে তাঁর কর্ণরন্ধ্র দিয়ে নির্গত বায়ুর অত্যধিক মাত্রায় শব্দ হতে থাকে। যেমন– কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হতে নির্গত বায়ু। এর ফলে তাঁর বীর্য আরব্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় কিন্তু দুঃখ-বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত থাকে। তথাপি সেই দুঃখ-বেদনা তাঁর চিত্তকে অধিকার করতে পারে নেই।[৩০]

এরপর তিনি মুখে, কর্ণে ও নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করেন। এতে তাঁর শিরে অধিকমাত্রায় বায়ু প্রতিহত হতে থাকে, যেন কোন বলবান পুরুষ তীক্ষ্ম শিখর অর্থাৎ তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে শিরে আঘাত করে। এর মাধ্যমে তাঁর বীর্য আরদ্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় কিন্তু দুঃখ বিনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখ-বেদনা তাঁর চিত্তকে অধিকার করতে পারে নেই।

এরপর তাঁর দেহে অধিকমাত্রায় দাহ উপস্থিত হয়। যেমন-দু'জন বলবান পুরুষ কোন এক দুর্বলতর ব্যক্তির দুই বাহুতে ধরে জলন্ত অঙ্গারে সন্তপ্ত ও সম্পরিতপ্ত করে। এর দ্বারা তাঁর বীর্য আরদ্ধ হয়, স্মৃতি উপস্থাপিত হয় কিন্তু দুঃখ-বেদনাক্লিষ্ট দেহ অশান্ত হয়। তথাপি সেই দুঃখ-বেদনা তাঁর চিত্তকে অধিকার করতে পারে নেই।[৩১] কুমার সিদ্ধার্থ যখন এরূপ 'আস্ফানক' ধ্যানরত তখন মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হল যে, তিনি জীবিত না মৃত তা জানা দুষ্কর হয়েছিল, কারণ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে রুদ্ধবৎ হয়েছিল। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে কোন কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বললেন, "বুঝি, শ্রমণ গৌতম কালগত হয়েছে।" কোন কোন দেবতা বললেন, "শ্রমণ গৌতম কালগত হননি, তবে কালগত হবেন।" আবার কোন কোন দেবতা বললেন, "শ্রমণ গৌতম কালগত হননি, তিনি কালগত হবেননা। তিনি অরহত্ব লাভ করবেন। অর্হতের ধ্যানবিহার এরূপ হয়।" ইত্যবসরে কোন্ডণ্যপ্রমুখ পাঁচজন সন্ন্যাসী লক্ষ্যহীনভাবে গ্রাম, জনপদ ও দেশ-দেশান্তর বিচরণ করতে করতে অবশেষে একদিন কুমার সিদ্ধার্থের সাধনভূমিতে এসে উপনীত হলেন। অতঃপর তাঁরা কঠোর সাধনারত কুমার সিদ্ধার্থকে প্রয়োজনীয় সেবাযত্ন ও পরিচর্যা করলেন এবং ভাবলেন, "সম্ভবত এখনই ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন, এখনই ইনি বুদ্ধত্ব লাভ করবেন।" আশায় দীর্ঘ ছয় বছর অতিবাহিত করলেন।[৩২] রাজকুমার সিদ্ধার্থ চরম কৃচ্ছতাসাধনের সংকল্প নিয়ে সকল প্রকার আহার পরিত্যাগ করার মনস্থ করলেন। ক্রমশ তিনি আহার কমাতে কমাতে দিনে একটি মাত্র তন্ডুল বা তিল বা কূল ভক্ষণ করতেন।[৩৩] পালি মজ্জিম নিকায়ের "মহাসীহনাদ সুত্তে" ভগবান নিজেই তাঁর আহার উপচ্ছেদ ও এর পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন–

"আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি চতুরঙ্গ সমন্বিত ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছি; আমি তপস্বী হয়েছি- পরম তপস্বী; আমি রুক্ষ হয়েছি - পরম রুক্ষ (কঠোর সাধক); জুগুপ্সী হয়েছি- পরম জুগুপ্সী; প্রবিবিক্ত হয়েছি- পরম প্রবিবিক্ত (পরমকেবলী)।

Dhaka University Institutional Repository

Avgvi Zc¯xZvi ¯i/c Gi/c:

আমি অচেলক (নগ্ন প্রব্রজিত), মুক্তাচারী, হস্তাবলেহী হয়েছি। "ভদন্ত! আসুন ভিক্ষা গ্রহণ করুন"– এরূপ বললে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিনি। আমার জন্য ভিক্ষান্ন প্রস্তুত হয়েছে জেনেও তা গ্রহণ করিনি। কোন নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিনি। কুম্ভীমুখ (পাত্রাভ্যন্তর) হতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিনি। কলোপিমুখ (কটোরাভ্যন্তর) হতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিনি, কারণ এতে চামচের আঘাতে ব্যাথা পায়।

উনুনের মধ্যে রেখে কেউ ভিক্ষা দিলেও তা গ্রহণ করিনি, কারণ সে উনুনে পড়ে যায়। মুষলের মধ্যে রেখে কেউ ভিক্ষা দিলে তা গ্রহণ করিনি, কারণ তা মুষলে পড়ে যায়। যেখানে দুজনে ভোজন করছে তন্মধ্যে একজনকে ভোজন ত্যাগ করে ভিক্ষা দিতে হলে ভিক্ষা গ্রহণ করিনি, কারণ তার আহার নষ্ট হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিক্ষা দিলে তা গ্রহণ করিনি, কারণ গর্ভস্থ সন্তান কষ্ট পায়। শিশুকে স্তন্যপান করার সময় ভিক্ষা দিলে তা গ্রহণ করিনি, কারণ এতে শিশুর কষ্ট হয়। সৎকাজের সময়[৩৪] ভিক্ষা গ্রহণ করিনি। খাবার পাওয়ার আশায় যেখানে কুকুর দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানে আহারের উদ্দেশ্যে মক্ষিকা একত্র সঞ্চরণ করে, সেখানে ভিক্ষা গ্রহণ করিনি। মৎস-মাংস আহার করিনি, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিনি। মাত্র একগৃহ হতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন একগ্রাস ভোজন করেছি, দুই গৃহ হতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন মাত্র দুই গ্রাস ভোজন করেছি। এভাবে সপ্ত গৃহ হতে সংগৃহীত ভিক্ষান্ন মাত্র সাত গ্রাস ভোজন করেছি। মাত্র একদত্তির (অর্থাৎ একবার প্রদত্ত পরিমিতদানে) দিয়ে দিন যাপন করেছি, মাত্র দুই দত্তিতে দিন যাপন করেছি। এভাবে মাত্র সাত দত্তিতে দিন যাপন করেছি। একদিন অন্তর, দু'দিন অন্তর, তিনদিন অন্তর এভাবে সপ্তাহ অন্তর আহার করেছি। এভাবে এমনকি অর্ধমাস অন্তর অন্তর ভিক্ষান্ন ভোজনে নিরত হয়ে অবস্থান করেছি। শাকভোজী, শ্যামাকভোজী, নীবারভোজী, দুর্দরভোজী[৩৫], পরিত্যক্ত শাক সবজির খোসা ভোজী, শৈবাল ভোজী, কণভোজী, আচামভোজী, পিন্যাক-ভোজী,[৩৬] তৃণভোজী, গোময়ভোজী, ফলমূলাহার কিংবা ভূপতিত ফলভোজী হয়ে দিনযাপন করেছি। আমি শানবাকচেল ধারণ করেছি, মশাললব্ধ বস্ত্র ধারণ করেছি, শবাচ্ছাদন ধারণ করেছি, পাংশুকুল (পরিত্যক্ত নক্তক) ধারণ করেছি। তিরীট (বল্কল) ধারণ করেছি, ফলকচীর (দারুচীবর) ধারণ করেছি, কেশকম্বল ধারণ করেছি, কেশশ্মশ্রু উৎপাটন কাজে নিরত হয়েছি। উৎকুটিত[৩৭] হয়ে, উৎভ্রষ্টিক[৩৮] হয়ে আসন পরিত্যাগপূর্বক উৎকুটিক সাধনে নিরত হয়েছি। কন্টকশায়ী হয়ে কন্টকশয্যায় শয়ন করেছি। দিনে তিনবার উদক অবতরণ[৩৯] কার্যে নিরত হয়েছি। এভাবে বহুপ্রকার বহুবিধ কায়তাপন, পরিতাপন অভ্যাসে নিযুক্ত হয়ে বিচরণ করেছি। এটাই আমার পক্ষে পূর্বতপস্বিতা।

বহুবছর ধরে আমার দেহে ধূলোবালি সঞ্চিত হয়ে পাট বেঁধেছে। যেমন বহু বছর ধরে তিন্দুকস্থান রাশীকৃত হয়, তেমনভাবেই বহু বর্ষ ধরে আমার অঙ্গে রজঃমল সঞ্চিত হয়ে পাট বেঁধেছে। এতে আমার কখনও মনে হয়নি যে, আমি এই রজঃমল হাত দিয়ে পরিমার্জিত করব বা অপর কেউ আমার অঙ্গের এই রজঃমল হাত দিয়ে পরিমার্জিত করবে– সেটাও আমার মনে হয়নি। এটাই আমার পক্ষে পূর্বরুক্ষতা বা কঠোর সাধন।

আমি স্মৃতিমান হয়ে সাবধানে চলাফেরা করেছি, যাতে বিপাকে পড়ে আমি কোন ক্ষুদ্র প্রাণীকেও আঘাত না করি। সামান্য জলবিন্দুতেও আমার দয়া উপস্থিত হয়েছিল। এটাই আমার পক্ষে পূর্বজুগুপ্সতা অর্থাৎ পাপে ঘৃণা।

আমি অরণ্যে বিচরণ করেছি। যখনই কোন গোপালককে, পশুপালককে, তৃণহরণকারীকে, কাষ্ঠহরণকারীকে, বনে ফলমূল সন্ধানকারীকে বা বনকর্মীকে দেখেছি, আমি বন হতে বনে, গহন হতে গহনে, নিম্ন হতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হতে উচ্চস্থলে গিয়ে পড়েছি যাতে তারা আমাকে দেখতে না পায় এবং আমিও তাদেরকে দেখতে না পাই। যেমন- অরণ্যচারী মৃগ মানুষকে দেখে বন হতে বনে, গহন হতে গহনে, নিম্ন হতে নিম্নস্থলে, উচ্চ হতে উচ্চস্থলে ছুটে যায়, তেমনি আমিও যখনই কোন মানুষকে দেখেছি তখনই বনের আরও গহনে গিয়েছি, যাতে তারা আমাকে দেখতে না পায় এবং আমিও তাদেরকে দেখতে না পাই।[৪০] এটাই আমার পক্ষে প্রবিবিক্ততা অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যসাধন।

যখন গোষ্ঠ হতে সকল গাভী চরে গিয়েছে, গোপালকগণও চলে গিয়েছে তখন হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে গিয়ে স্তন্যপায়ী তরুণ বাছুরের গোময় আমি আহার করেছি। ভূপতিত হওয়ার পূর্বেই স্বমলমূত্র গ্রহণ করে আহার করেছি। এটাই আমার পক্ষে পূর্বমহাবিকট ভোজন।

শীত ও হেমন্ত ঋতুতে, হিমপাত সময়ে, অন্তর অষ্টকায়[৪১] যে সকল বিভীষিকাময় রাত আছে সে সকল রাতে সারা রাত উন্মুক্ত আকাশতলে এবং সারাদিন বনখন্ডে বিচরণ করেছি। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ মাসে দিনে উন্মুক্ত আকাশতলে এবং রাতে বনখন্ডে বিচরণ করেছি। বিচরণকালে আমার মনে এই অশ্রুতপূর্ব আশ্চর্য ভাবোদ্দীপক গাথা স্ফূর্ত হয়েছিল। গাথা নিম্নরূপ-

তপ্ত[৪২] সিক্ত[৪৩], একা আমি ভীষণ সে বনে
নগ্ন[৪৪], অচেলক মুনি আসীন আসনে
অগ্নি বিনা, মৌন ধ্যায়ী[৪৫] লক্ষ্যের সাধনে ॥

আমি কখনও শ্মশানে শবাস্থিকে উপাদান করে শয়ন করেছি। এমনও ঘটেছে যে, গোপালকগণ আমার কাছে এসে আমার শরীরে নিষ্ঠীবন (থুতু) নিক্ষেপ করেছে, কর্ণকুহরে শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। অথচ আমি বিশেষভাবে জানি যে, আমি কখনও তাদের প্রতি পাপচিত্ত উৎপাদন করিনি। দীর্ঘদিন পর চোখ মেলে দেখলেন, প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভা এবং বনরাজির অপূর্ব রূপান্তর। নিজের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, অনাহার, অনিদ্রায় ও কঠোর তপস্যায় দেহ ও রূপ যৌবনের কী পরিবর্তন! শরীরে শক্তি একেবারেই নেই। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিনতে অক্ষম। হস্তপদ সঙ্কোচিত ও প্রসারিত করতে অপারগ, যেন সমস্ত কলেবর লৌহ নিমিত্ত প্রতিমূর্তি। নিজের শরীরে হাত বুলাতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, শরীরের লোমসমূহ অঙ্গ হতে স্খলিত হয়ে পড়ছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভাবলেন, আমার সকল আশা নিস্ফলে পর্যবসিত হল। এই দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় কিছুই অর্জন হলনা। জগতে এমন আর কি তপস্যা আছে, যা দিয়ে মহাজ্ঞান লাভ করতে পারব। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন, "অহো! বৃথা আমি শরীর ক্ষয় করেছি। অনর্থক সংসার ছেড়ে বিশাল সমুদ্রে ঝাপ দিয়েছি। জনমানবের দুঃখ মোচনার্থে সংসার ত্যাগ করলাম। কিন্তু এখন জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুপূর্ণ সংসারে তাহলে কি আমাকে আবার ফিরতে হবে? হায়! মানবের মুক্তি কোথায়? নির্বাণ কি নেই? উদ্ধারের পথ কি নেই? তপস্যায় এই কষ্ট। এই কষ্টে কি মৃত্যু!" তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেন যথার্থ পথভ্রষ্ট বোধিসত্ত্ব কি উপায়ে কোন্ পথ অবলম্বনে বোধি জ্ঞান লাভ করবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল। কুমার সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবলেন, "অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনা জনিত দুঃখ, তীব্র ও কঠোর বেদনা অনুভব করেছিলেন, এটাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে কঠোর বেদনা হতে পারে না। অনাগতে যেসকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সাধনাজনিত দুঃখ, তীব্র, তীক্ষ্ম ও কঠোর বেদনা অনুভব করেন, এটাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এর অধিক আর কোন বেদনা হতে পারে না। কিন্তু আমি এই দুষ্করচর্য্যার মাধ্যমে লোকাতীত ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দর্শন লাভ করতে পারিনি। তবে কি বোধি লাভের অন্য কোনও পন্থা নেই?" এই ব্যাকুলতা নিয়ে নিশাবসানে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলেন, দেবরাজ ইন্দ্র আকাশকে আলোকিত করে এক অপরূপ মূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছে। তাঁর হাতে এক রত্নময় সুন্দর ত্রি-তন্ত্রী ধ্বনিত হচ্ছে। সে ত্রি-তন্ত্রী এক তার অতীব শ্লথ, যেটা বাজলনা, আরেক তার টানতেই ছিন্ন হয়ে গেল। অপর তার এমন মধুর স্বরে বেজে উঠল, যাতে যোগীর কর্ণে সুধার অমিয় ধারা বর্ষিত হল। তৎপর দেবরাজ আস্তে আস্তে শূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। এরপর কুমার সিদ্ধার্থের চৈতন্যের সঞ্চার হল। তিনি বুঝতে পারলেন ভোগ-বিলাস ও কৃচ্ছতাসাধনা উভয়ই সিদ্ধি লাভের পরিপন্থী। অতএব উভয় দিক পরিত্যাগ করে মধ্যমপথ অবলম্বনে অর্থাৎ দেহ ও মনের সুস্থতার মধ্যদিয়ে তপস্যা করবেন, এটাই স্থির করলেন। তারপর তিনি বহু কষ্টে নিজের দেহের উপর ভর দিয়ে কোন প্রকারে নৈরঞ্জনা নদীতে গিয়ে স্নান

করলেন। স্নানে অনেক শান্তি প্রীতি অনুভব করে নদীর তীরে উঠলেন। তারপর সেখানেই এক বৃক্ষের ছায়াতলে উপবেশন করলেন। সেদিনই সেনানীকন্যা সুজাতা দেবী সুবর্ণ পাত্রে পায়সান্ন শিরে বহন করে বনদেবতার পূজা দিতে বনে আগমন করলেন। হঠাৎ তপস্বীকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন- "উনি কে! তরুতলে এক মূর্তি? উনি কি বনদেবতা?" তার মন আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠল। অতঃপর সুজাতা দেবী ভক্তিপ্রণত চিত্তে শ্রদ্ধার সাথে তপস্বীর সামনে পায়সান্ন রেখে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন–"আমি মানত করেছিলাম, পুত্রসন্তান লাভ করলে বনদেবতাকে পায়সান্ন দিয়ে পূজা করব। এতে আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েছে। বনদেবতা! কৃপা করে এ দাসীর পূজা গ্রহণ করুন।" রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন- "ভগিনী! আমি বনদেবতা নই, সামান্য একজন তপস্বী মাত্র। অনাহার, অনিদ্রায় এ জনমানবহীন বনে কঠোর তপস্যায় রত আছি। ভদ্রে, আমি ক্ষুধায় অতীব কাতর। সাদরে তোমার পায়সান্ন গ্রহণ করলাম। আমি আশীর্বাদ করি তোমার মনোরথ সিদ্ধ হোক এবং তুমিও প্রার্থনা কর, তোমার পায়সান্ন খেয়ে পরিপুষ্টতা লাভ করে আমারও মনোরথ যেন সিদ্ধ হয়।" এরূপে সুজাতাদেবীর পায়সান্ন খেয়ে যোগী কিছুটা সুস্থ হলেন এবং নিকটস্থ গ্রামে ভিক্ষান্নে ক্রমশ যোগক্ষম হয়ে বোধিসত্ত্ব বোধিবৃক্ষকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং বোধিবৃক্ষকে পেছনে রেখে পূর্বদিকে মুখ করে পূর্বের যোগাসনে বসে বোধিসত্ত্ব সংকল্প করলেন–

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু,
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুল্লভং,
নৈবসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে–"

(ললিত বিস্তর, ১৯শ অধ্যায়, শ্লোক-১৭)[৪৬] পৃ: ৩৬২

ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের অন্যতম পর্যায় হল মার বিজয়। বোধিসত্ত্বের মার বিজয় সম্বন্ধে পবিত্র গ্রন্থ ত্রিপিটকে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। তবে 'মার সেনা', 'মার পরিসা', 'মারাভিভু' ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়।[৪৭] খুদ্দকনিকায়ের[৪৮] সুত্তনিপাত গ্রন্থের প্রধান সুত্তে এবং ললিত বিস্তরের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বোধিসত্ত্বের মার বিজয় সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়। এক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ নিজেই বলেছেন:

আমি যখন নৈরঞ্জনা নদীর সন্নিকটে দুষ্করচর্যার ব্রত নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগে নির্বাণ লাভার্থ ধ্যানরত ছিলাম, তখন মার[৪৯] করুণ বাক্য বলতে বলতে আগমন করল - '(হে সিদ্ধার্থ) তুমি কৃষ ও বিবর্ণ হয়েছ, তোমার

মৃত্যু আসন্ন, তোমার একাংশ জীবনের সহস্রভাগ মৃত্যুর আয়ত্তে। তুমি জীবন ধারণ কর। জীবনই শ্রেষ্ঠ। জীবন ধারণ করলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবে। এই দুষ্করচর্যায় তোমার কি লাভ? তপস্যার মার্গ কঠিন, দুর্গম, দুরতিক্রম্য'– একথা বলতে বলতে মার বোধিসত্ত্বের সামনে এসে দন্ডায়মান হল। বোধিসত্ত্ব মারকে বললেন- 'হে প্রমত্তবন্ধু পাপী, তুমি কেন এখানে এসেছ? আমি শ্রদ্ধা, বীর্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন; আমি সম্যক সংকল্পবদ্ধ; কেন আমাকে জীবন উপভোগ করতে অনুরোধ করছ? রক্ত শুষ্ক হলে পিত্ত এবং শ্লেষ্মাও শুষ্ক হয়। মাংস ক্ষয়প্রাপ্ত হলে চিত্ত অধিকতর শান্ত হয়। আমার স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অধিকতর অটল। এরূপ সর্বোত্তম অনুভূতির অভিজ্ঞতালব্ধ হয়ে অবস্থানের ফলে আমার চিত্ত ভোগ বিলাসে আকৃষ্ট হয়না।'

কাম তোমার প্রথম সেনা; অরতি তোমার দ্বিতীয় সেনা; ক্ষুৎপিপাসা তৃতীয় সেনা; তৃষ্ণা চতুর্থ সেনা; আলস্য ও তন্দ্রা পঞ্চম সেনা; ভীরুতা ষষ্ঠ; সংশয় সপ্তম; জড়তা তোমার অষ্টম সেনা। এছাড়াও রয়েছে যশ, লোভ, সৎকার, মিথ্যালব্ধ খ্যাতি, আত্মপ্রশংসায় ব্রত হয়ে অপরকে ঘৃণা করা– এগুলোকে আমি তোমার সেনা মনে করি। আমি মুঞ্জতৃণের বস্ত্র পরিধান করে আছি। এই জগতে জীবনকে ধিক! পরাজিত হয়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। হে মার, চতুর্দিকে তোমার সেনাদলকে দেখে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমাকে তুমি স্থানচ্যুত করতে পারবেনা। দেব-মনুষ্য কর্তৃক অপরাজেয় তোমার সেনাদলকে আমি প্রস্তরাঘাতে মৃৎপাত্রের ন্যায় বিধ্বস্ত করব। সংকল্পকে বশীকৃত করে, স্মৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে আমি রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রান্তরে শিষ্যগণকে ব্যাপকরূপে শিক্ষা দান করে বিচরণ করব। আমার শিষ্যগণ অপ্রমত্ত ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হয়ে আমার মত নিষ্কাম ব্যক্তির আদেশ পালন করে শোকহীন অবস্থা উপলব্ধি করবে। তখন মার বলল- 'সাত বছর ধরে আমি ভগবানের প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণ করেছি। কিন্তু স্মৃতিমান সম্বুদ্ধ আমার কাছে দুরধিগম্যই রয়ে গিয়েছেন।' এ কথা বলে হতাশ ও দুঃখাভিভূত মার প্রস্থান করল।[৫০] খুদ্দক নিকায়ের সুত্তনিপাত গ্রন্থের প্রধান সুত্ত, ললিত বিস্তরের অষ্টাদশ অধ্যায়ের ন্যায় জাতনিদানকথায়ও[৫১] মার বিজয় সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে।

রাজর্ষি বংশোদ্ভূত মহামতি গৌতম মানুষের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করে ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। এতে জগৎ আনন্দিত হল কিন্তু সৎ ধর্মের শত্রু 'মার' সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। লোকে কামদেব, চিত্রায়ুধ, পুষ্পশর প্রভৃতি বলে, সেই কাম প্রচারের অধিপতিকে মোক্ষরিপু মারও বলা হয়। মারের রয়েছে তিনপুত্র- বিভ্রম, হর্ষ এবং দর্প; তিন কন্যা- রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা। তারা তাকে মনের বিকারের কথা জিজ্ঞেস করলে

মার বলল, 'ধর্ম পরিহিত ধনুর্ধর মহামতি গৌতম শর আকর্ষণ করে তার রাজ্য জয়ে অভিলাষী হয়েছেন। সেজন্যই আমার চিত্তের এই বিষাদ। মার সিদ্ধার্থ গৌতমের ধ্যানে বাধা সৃষ্টি করার জন্য নিজের সৈন্যদলকে স্মরণ করল। মার ভাবল, এই ব্যক্তি আনন্দদায়ক বস্তু বা রতি ক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ভূতগণের দ্বারা ভীতি প্রদর্শন, তর্জন ও প্রহারেরই উপযুক্ত। তখন পাহাড়, বৃক্ষ, বর্শা, গদা ও তরবারি হাতে নিয়ে বিভিন্ন আকারের অনুচর দল তাঁর চারদিকে এসে দাঁড়াল।

শূকর, মৎস্য, অশ্ব, গর্দভ আর উটের মতো তাদের মুখ। কারও মুখ বাঘ, ভালুক, সিংহ বা হাতির মতো। কারও কটি চোখ, কারও অনেক মুখ, কারও তিনটি মাথা, কারও উদর লম্বা আবার উদরে গোলাকার চিহ্ন। তাদের কারও জানু নেই, কারও বা উরু নেই, আবার কারও জানু ঘটের মতো, কারও অস্ত্র হল দাঁত আবার কারও অস্ত্র হল নখ। কারও কঙ্কালের মতো মুখ, কারও অনেক দেহ, কারও মুখের অর্ধেক অংশ ভাঙ্গা, আবার কারও মুখ বিশাল আকৃতির। কারও দেহ ভস্মের মতো কালো-লালে মিশ্রিত, কারও দেহ লাল লাল বিন্দুতে চিত্রিত। কারো হাতির মতো লম্বা কান, চামড়ার বস্ত্র, আবার কেউ নগ্ন। কারও মুখের অর্ধেক সাদা, দেহের অর্ধেক সবুজ, তামাটে, ধোঁয়াটে, নীল-হলুদে মেশানো। কারও বা সাপের উত্তরীয়, কোমরে শব্দময় বহু ঘন্টা বাঁধা। কেউ তালগাছের মতো লম্বা, হাতে শূল, কারও শিশুর মতো আকার, উচুঁ দাঁত, ভেড়ার মুখ, পাখির মতো চোখ, বিড়ালের মতো মুখ, মানুষের মতো দেহ। কারও ছড়ানো কেশ, কারও বা চূড়া বাঁধা, কেউবা অর্ধমুন্ডিত, কারও এলোমেলো পাগুড়ি, কারও মুখ প্রফুল্ল, কারও বা ভ্রুকুটিভরা।

কেউ চলতে চলতে বিরাট লাফ দিচ্ছিল, আবার কেউ অন্যের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল, কেউ শূন্যে উঠে গিয়ে খেলছিল, আবার কেউ গাছের মাথায় উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ ত্রিশূল ঘুরিয়ে নাচল আবার কেউ গদা ঘুরিয়ে আস্ফালন করল। কেউ আনন্দে ষাঁড়ের মতো গর্জন শুরু করল। এই ভূতেরা মহামতি গৌতমকে বধ করার আগ্রহে বোধিবৃক্ষকে ঘিরে দাঁড়াল তাদের প্রভু মারের আদেশের অপেক্ষায়। রাত্রির গোড়ার দিকে মারও শাক্যশ্রেষ্ঠের মধ্যে যুদ্ধের সময় উপস্থিত দেখে আকাশ মলিন হয়ে গেল, পৃথিবী কাঁপতে লাগল, সমস্ত দিক সশব্দে জ্বলে উঠল। সমস্ত দিকে বায়ু তীব্র বেগে প্রবাহিত হলো, নক্ষত্র দীপ্তিহীন হলো, চন্দ্র তার জ্যোতি হারাল। রাত্রি আরও গভীর অন্ধকার বিস্তার করল আর সমস্ত দিক সশব্দে জ্বলে উঠল। মার তখন উত্তেজিত ভূত সেনাদের ভয় উৎপাদনের আদেশ দিলেন। কোনো কোনো ভূত ভয় দেখাতে দেখাতে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের জিহ্বা দীর্ঘ ও চঞ্চল, দন্তের অগ্রভাগ তীক্ষ্ম, চক্ষু সূর্য

Dhaka University Institutional Repository

মন্ডলের মতো, বিদারিত মুখ আর কীলকের মতো কান। রূপে ও ভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর সেই ভূতগুলোকে দেখে মহামতি গৌতমের কোন উদ্বেগ ঘটলনা। কেউ কেউ বহু প্রস্তর ও বৃক্ষ তুলেও মহামতি গৌতমের প্রতি নিক্ষেপ করতে পারলনা, বজ্রভগ্ন বিন্ধ্যাচলের মতোই তারা বৃক্ষ ও প্রস্তর নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কেউ কেউ আকাশে উঠে প্রস্তর, বৃক্ষ ও কুঠার নিক্ষেপ করল। কিন্তু সেগুলো নিচে পড়লনা, সন্ধ্যার নানা রঙ্গের মেঘের মতোই আকাশে রয়ে গেল। আর একজন তাঁর উপর পর্বতশৃঙ্গের সমান জলন্ত কাষ্ঠখন্ড নিক্ষেপ করল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র আকাশেই তা শতখন্ডে বিদীর্ণ হয়ে গেল। কেউ বা জলন্ত সুর্যের মতো উদিত হয়ে কল্পান্তে মেরুপর্বত যেমন তার স্বর্ণ গহ্বরের চূর্ণ বর্ষণ করে তেমনি আকাশ থেকে বিপুল জলন্ত কয়লা বর্ষণ করল। কিন্তু মহামতি গৌতমের মৈত্রীর প্রভাবে সেই বোধিবৃক্ষের মূলে ছড়িয়ে পড়া অঙ্গার বর্ষণ হয়ে উঠল রক্তপদ্মের পাপড়ি বর্ষণ। অন্য ভূত সেনারা জীর্ণ বৃক্ষরাজির মতো মুখ থেকে সর্প উদ্‌গীরন করল। সেই সর্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কাছে এলো, তারা নিঃশ্বাস নিলনা, মাথা তুলল না, নড়লও না। কিন্তু ভূত সেনারা বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রচন্ড গর্জনযুক্ত বিশাল মেঘ হয়ে সে বৃক্ষে শিলা-বৃষ্টি করল, সেই শিলাবর্ষণ মনোরম কুসুম বর্ষণে পরিণত হলো। আর এক ভূত পঞ্চবান নিক্ষেপ করল। সংসারভীরু জ্ঞানী ব্যক্তির পঞ্চইন্দ্রিয় যেমন বিষয়ের দিকে যায়না, তেমনি সেই পঞ্চবানও আকাশেই রয়ে গেল। আর এক ভূত বধের আকাঙ্খায় গদা নিয়ে মহর্ষির দিকে এগিয়ে গেল কিন্তু দূর্বল যেমন পাপে পতিত হয় তেমনি বিবশ হয়ে পড়ে গেল। মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী মহর্ষির চিত্তে মোহ সৃষ্টি করার জন্য নরকঙ্গাল হাতে নিয়ে অবিশ্রাম ঘুরতে লাগল। চঞ্চল স্বভাব পুরুষের বুদ্ধি যেমন শাস্ত্রে স্থির হয়না তেমনি সে-ও স্থির হলো না। একটি বিষাক্ত সর্পের মতো তাঁকে দগ্ধ করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। কিন্তু কামী ব্যক্তি যেমন কল্যাণের পথ দেখতে পায়না সে-ও তেমনি উপবিষ্ট ঋষিকে দেখতে পেলনা। কেউবা বিরাট এক শিলাখন্ড তাঁর দিকে উদ্যত করল। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা লভ্য মুক্তি ধর্মকে দেহক্লেশের দ্বারা লাভ করতে গেলে মানুষ যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি তার চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। নেঁকড়ে বাঘ ও সিংহের আকৃতি বিশিষ্ট অন্য ভূতেরা উচ্চকণ্ঠে বিপুল গর্জন করতে শুরু করল, চারদিকে প্রাণীরা তাতে বজ্রঘাতে আকাশ বিদীর্ণ হচ্ছে মনে করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। হরিণ আর হস্তীরা আর্তনাদ করতে করতে ছুটে গেল এবং আত্মগোপন করল। সেই রাত্রিতে দিনের মতোই আর্ত বিহঙ্গেরা চারদিক থেকে কোলাহল করতে করতে উড়তে লাগল। তাদের সেই শব্দে সমস্ত প্রাণী কম্পিত হলেও মহামতি গৌতম কিন্তু ভীত হলেন না ঠিক যেন কাকের শব্দে গরুড় যেন ভীত হয়না। তখন অদৃশ্যমূর্তি কোনো বিশিষ্ট প্রাণী গৌতম ঋষির প্রতি মারের অনিষ্ট আচরণ এবং বিনা শত্রুতার ক্রোধ দেখে আকাশ থেকেই গম্ভীর স্বরে বললেন, ''হে মার, বৃথা শ্রম করোনা, হিংস্রভাব ত্যাগ করো, শান্ত হও। বায়ু যেমন মহাগিরি

মেরুকে কম্পিত করতে পারেনা তেমনি তুমিও এঁকে কম্পিত করতে পারবেনা। অগ্নি তার উষ্ণতা ত্যাগ করতে পারে, জল তার তরলতা ত্যাগ করতে পারে, আর পৃথিবীও তার স্থিরতা ত্যাগ করতে পারে কিন্তু বহুকল্পসঞ্চিত পুণ্যের অধিকারী মহামতি গৌতম তাঁর সৎ সংকল্প ত্যাগ করবেন না, কারণ তাঁর যে সংকল্প, যে পরাক্রম, যে তেজ, প্রাণীদের প্রতি যে দয়া তাতে সত্যলাভ না করে ইনি উঠবেন না; ঠিক যেমন অন্ধকার নাশ না করে যেমন সূর্য কখনও ওঠেনা। কাষ্ঠ ঘর্ষণ করতে করতে মানুষ অগ্নি লাভ করে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে জলও পায়। তেমনি তীব্র আগ্রহশীল ব্যক্তির অসাধ্য বলে কিছু নেই। অর্থাৎ ন্যায়ের সঙ্গে যা যুক্ত তা সবই সিদ্ধ হয়। ধার্মিকগণের শত্রু মার বোধিসত্ত্বকে বলল-

কামেশ্বরোহস্মি বসিতা ইহ সর্বলোকে
দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্য্যা,
ব্যাপ্তা ময়া মম বশেন চ যান্তি সর্বে
উত্তিষ্ঠ মহ্য বিষয়স্থ বচং কুরুস্ব।[৫২]

অর্থঃ আমি কাম রাজ্যের অধিপতি, ইহ সংসারে দেব দানব মনুষ্য, তির্য্যক সকলেই আমার বশীভূত। আমি সংসার ব্যাপী অবস্থান করছি। সংসারে সকল পদার্থই আমার বশে চলছে। অতএব হে বোধিসত্ত্ব, তুমি যোগাসন ত্যাগ করে উত্থিত হও এবং আমার কথানুসারে তোমার মনকে বিষয়ভোগে রত কর।
বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন-

কামেশ্বরোহসি যদি ব্যক্তমনীশ্বরোহসি
ধর্ম্মেশ্বরোহম্পি পশ্যসি তত্ত্বতো মাম্।
কামেশ্বরোহসি যদি দুর্গতি ন প্রযাসি
প্রাপ্স্যামি বোধি চ সমস্যতু পশ্যতস্তে॥[৫৩]

অর্থঃ হে মার, তুমি কামনাসমূহের অধিপতি, তোমার আত্মসংযম নেই; সুতরাং কোনও বিষয়ের উপরেই তোমার প্রভুত্ব নেই। হে কামেশ্বর, তুমি যদি দুর্গতিপ্রাপ্ত না হও, তাহলে দেখবে আমি তোমার সামনে বুদ্ধত্ত্ব লাভ করব।

এভাবে মার সৈন্যগণ, মারপুত্রগণ, মার দুহিতৃগণ এবং মার স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হল।[৫৪] এতে মার অনুতাপ করে বলল-

''দুঃখ; ভয়; ব্যসনশোকবিনাশঞ্চ
ধিক্কারশব্দমবমানগতঞ্চ দৈন্যম্ ।
প্রাপ্তে- হস্মি অদ্য অপরাধ্য সুশুদ্ধসত্ত্বে
অশ্রুত্ব বাক্য মধুরং হিতমাত্মজানাম্ ॥''[৫৫]

শুদ্ধসত্ব বোধিসত্ত্বের অনিষ্ট সাধন করতে গিয়ে আজ আমি দুঃখ, ভয়, ব্যসন, শোক, অপমান, দৈন্য, ধিক্কার ইত্যাদি বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হলাম। আমার নিজের কন্যাগণের হিতকর ও মধুর বাক্য না শুনে আজ আমার এই ফললাভ হল। বোধিসত্ত্ব এভাবে ধার্মিকগণের শত্রু মারকে পরাজিত করে নিরুপদ্রবচিত্তে ধ্যানসুখ[৫৬] ভোগ করতে লাগলেন। তিনি কাম্যবস্তু ও অকুশল হতে বিরত হয়ে সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখ মন্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। এরূপে উৎপন্ন সুখ বেদনাও তাঁর চিত্ত অধিকার করে থাকতে পারেনি। তিনি অতঃপর বিতর্ক বিচার উপশমে আধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনায়নকারী, বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখ মন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। এরূপে উৎপন্ন সুখ বেদনাও তাঁর চিত্ত অধিকার করে থাকতে পারেনি। অতঃপর তিনি প্রীতি-বিমুক্ত হয়ে উপেক্ষার ভাবে অবস্থান করেন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে (প্রীতি নিরপেক্ষ) সুখ অনুভব করত তৃতীয় ধ্যান লাভ করে তাতে অবস্থান করেন। এরূপে উৎপন্ন সুখ বেদনাও তাঁর চিত্ত অধিকার করে রাখতে পারেনি। অতঃপর তিনি সর্বদৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্বেই সৌর্মনস্য ও দৌর্মনস্য (মনের হর্ষ- বিশাদ) অস্তমিত করে, না-দুঃখ-না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে তাতে বিচরণ করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থের মহাদিনের সুপ্রভাত, শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা সমাগত। এরূপে সমাহিত চিত্তের সেই পরিশুদ্ধ, পরিষ্কৃত, নিরঞ্জন, উপক্লেশ বিগত, মৃদুভূত, কমনীয়, স্থির, নিষ্কম্প অবস্থায় তিনি রাত্রির প্রথম যামে স্বীয় পূর্ব নিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান অর্জন করলেন। তিনি তাঁর সহস্র জন্ম পর্যন্ত স্মরণ করলেন। সেই আবির্ভাবে জন্ম-মৃত্যুর কথা স্মরণ করে সেই সদয় পুরুষ প্রাণীদের প্রতি দয়া অনুভব করলেন। এভাবে চিন্তা করতে করতে সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষের স্থির বিশ্বাস হলো যে, জগৎ সংসার কদলী বৃক্ষের গর্ভের মতো সারহীন। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তিনি সকল প্রাণীদের জন্ম-রহস্য উদঘাটন করলেন। তিনি রাত্রির এই যামে শ্রেষ্ঠ পরম দিব্য চক্ষু লাভ করলেন। তখন সেই দিব্য বিশুদ্ধ নয়ন দিয়ে তিনি যেন নির্মল দর্পণে সারা বিশ্ব দর্শন করলেন। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কর্মের প্রাণীদের কর্ম অনুসারে বিনাশ ও জন্ম

দেখে তার কারুণ্য বৃদ্ধি পেল। এই দুষ্কর্মকারীরা স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। পূর্বোক্ত ঐ প্রাণীরা অতি ঘোর ভয়ঙ্কর নরকে উৎপন্ন হয়ে নানা প্রকার দুঃখে করুণভাবে পীড়িত হচ্ছে। কাউকে আগুন রঙের গতি লোহার রস পান করানো হচ্ছে, অন্যদের অতি তপ্ত লোহার স্তম্ভে বসিয়ে দিচ্ছে, তারা আর্তনাদ করছে। লোহার কলসিতে নিচের দিকে মুখ করিয়ে রেখে কাউকে খাদ্যদ্রব্যের মতো পাক করছে। কাউকে জ্বলন্ত অঙ্গার রাশির মধ্যে করুণভাবে দগ্ধ করছে। কাউকে তীক্ষ্ম লোহার দাঁত দিয়ে ভয়ঙ্কর কুকুরেরা, আবার কাউকে যেন লোহার তৈরী ধৃষ্ট কাকেরা লোহার তৈরী মুখ দিয়ে ভোজন করছে। দাহে অবসন্ন কেউ কেউ শীতল ছায়ায় অভিলাষী হয়ে বন্দীর মতো অন্ধকার অসিপত্রে'র বনে গমন করছে। হাত বাঁধা কাউকে কুঠার দিয়ে কাঠের মতো বিদীর্ণ করছে। দুঃখেও তারা মৃত্যুবরণ করছেনা। কর্ম তাদের প্রাণ ধারণ করেছে। সুখ হবে মনে করে দুঃখ নিবৃত্তির জন্য যে সকল কর্ম তারা করেছিল তার ফল হিসেবে দুঃখই তারা ভোগ করছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। পাপী প্রাণীরা হাসতে হাসতে যে পাপ করেছে পরিণামকালে কাঁদতে কাঁদতে এই ফল ভোগ করছে। যদি পাপীরা কর্মের এমন ফল দেখতে পেত তবে যেন মর্মস্থলে আহত হয়ে উষ্ণরক্ত বমন করত। অবশ্য এই হতভাগ্যরা চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু বিভিন্ন কর্ম করেছে, যার ফলে পশুপাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। সেই অবস্থায় তারা মাংস, চর্ম, কেশ বা দন্তের জন্য কিংবা শত্রুতা বা অহঙ্কারবশত বন্ধুজনের সম্মুখেই নিহত হচ্ছে। যারা গরু ও ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে তারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমে পীড়িত হয়ে অসমর্থ হলেও কশার আঘাত ক্ষতদেহে বহন করতে বাধ্য হচ্ছে। বলিষ্ঠ হস্তীতে পরিণত হয়েও অঙ্কুশের আঘাতে তাদের মস্তক ক্লিষ্ট। সেই অবস্থায় অন্য অনেক দুঃখ থাকলেও বিশেষ দুঃখ হচ্ছে পরস্পর বিরোধ এবং পরাধীনতা। কারণ পরস্পরকে ধরে আকাশচারীরা আকাশচারীদের, জলচরেরা জলচরদের এবং স্থলবাসীরা স্থলবাসীদের পীড়ন করছে। রাত্রির তৃতীয় যামে জীব-জগতের কার্য-কারণ নীতি উপলব্ধি করে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় সম্বোধি লাভ করে যখন 'বুদ্ধ' (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৯ বা ৫২৮) তখন তথাগত আনন্দোচ্ছ্বাসে সত্যের সারিত কণ্ঠে বললেন–

Dhaka University Institutional Repository

"অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং,
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পনং,
গহকারক! দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি,
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিস্ঙ্খিতং,
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।[৫৭]

জন্ম-জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ,
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর,
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

আমি দেহরূপ গৃহনির্মাতা, তৃষ্ণারূপ সূত্রধরকে অনুসন্ধান করে বহু জন্ম-জন্মান্তর সংসারে পরিভ্রমণ করেছি। এতদিন তার দেখা পাইনি। সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে কত দুঃখ ভোগ করেছি। হে গৃহকারক। এবার তোমার দেখা পেয়েছি। পুনরায় তুমি দেহরূপ গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার এই গৃহ রচনার সমস্ত উপকরণ ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। আমার চিত্ত এখন বিসংস্কারগত এবং তৃষ্ণাসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সে জ্যোৎস্নাস্নাত বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রির শেষ যামে ধ্যানস্থ হয়ে তিনি বিমুক্তি-সুখ অনুভব করতে করতে উদ্ভাবন করলেন– দুঃখের কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা ধ্বংস হলে পরবর্তী কার্যাদি ধ্বংস হয় এবং জন্ম নিবৃত্ত হলে ঘূর্ণায়মান সংসারচক্রের দুঃখ পরিত্রাণ লাভ করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধ আবারো প্রীতিগাথা গাইলেন–

যদা হবে পাতু ভবন্তি ধম্মং
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স,
অথস্স কঙ্খা বপয়ন্তি সব্বা
যতো পজানতি সহেতু ধম্মন্তি।[৫৮]

শ্রদ্ধা আদি বোধিপক্ষীয় ধরম
প্রকাশ্যে যখন হয় সমাগম,
ধ্যানী, বীর্যবান ব্রাহ্মণের হয়
সকল সংশয় তখন লয়–
এই দুঃখরাশি কোন্ হেতু আসে
যবে হয় সেই জ্ঞানের উদয়।[৫৯]

জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তা চিন্তা করে তিনি উপলব্ধি করলেন–

"ইমস্মিং সতি ইদং হোতি,
ইমস্সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি॥"[৬০]

অর্থাৎ ইহা বিদ্যমান থাকলে তাহা উৎপন্ন হয়, ইহার উৎপত্তিতে তাহা উৎপন্ন হয়।

বোধিসত্ত্ব বুঝলেন, জন্ম হলেই জরা এবং মৃত্যু অভিভূত করে। জন্মের কারণ হলো ধর্ম। কোন সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি কিংবা আত্মা অথবা অভাব থেকে জীব উৎপন্ন হয়না। কর্ম উৎপন্ন হয় বিভিন্ন উপাদান থেকে। উপাদান হলো নানা নিয়ম, আচার ইত্যাদি। এইসব উপাদানের কারণ হলো তৃষ্ণা। তৃষ্ণার উৎস বেদনা (অনুভব)। বেদনার কারণ ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং মনের সংযোগ। এই সংযোগের নাম স্পর্শ। স্পর্শের কারণ ইন্দ্রিয়। অন্ধের চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় নেই, অতএব বিষয় দর্শন করে না বলে বিষয়ের সঙ্গে মনের স্পর্শ বা সংযোগ হয় না। নাম এবং রূপই ইন্দ্রিয়ের কারণ। নাম এবং রূপের কারণ হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান থেকে নাম এবং রূপ উৎপন্ন হয়। আবার নাম এবং রূপই হলো সেই আধার যাতে বিজ্ঞান আশ্রিত থাকে। জলে নৌকা মানুষকে বহন করে আবার স্থলে মানুষ নৌকাকে বয়ে নিয়ে যায়। তাই বিজ্ঞান এবং নাম-রূপ একটি আর একটির কারণ। এভাবে স্পর্শ থেকে অনুভব, অনুভব থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে উপাদান এবং উপাদান থেকে সত্তা বা অস্তিত্ব, অস্তিত্ব থেকে জন্ম এবং জন্ম থেকে জরা ও মৃত্যু উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সত্তার বিনাশে জন্মের অবসান ঘটবে এবং উপাদানের যদি নিরোধ ঘটে তবে সত্তাও নিরুদ্ধ হবে। উপাদানের অবসানের জন্য তৃষ্ণা দূর করতে হবে। বেদনা বা অনুভবের ধ্বংস হলে তৃষ্ণাও বিলুপ্ত হবে। স্পর্শ বা সংযোগের বিনাশ ঘটলে বেদনার অস্তিত্ব থাকবে না। দুটি ইন্দ্রিয় যদি না থাকে তবে স্পর্শ বা সংযোগও ঘটবে না। নাম এবং রূপ যদি নিরুদ্ধ হয় তবে ইন্দ্রিয় দুটিও বিনষ্ট হবে। বিজ্ঞানের নিরোধে

নাম এবং রূপও নিরুদ্ধ হবে এবং সংস্কার যদি নিরুদ্ধ হয় তবে বিজ্ঞানেরও সমাপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ অবিদ্যা ধ্বংস হলেই সমস্ত সংস্কার ধ্বংস হবে।

বোধিসত্ত্ব আবার উপলব্ধি করলেন-

''ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি,
ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি॥"[৬১]

অর্থাৎ এটা বিদ্যমান না থাকলে ওটা হয় না, এর নিরোধে তা নিরুদ্ধ হয়।

সিদ্ধার্থ গৌতম যে সত্যের অনুসন্ধানে মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন, 'আর্যসত্য' তারই প্রতিফলন। কার্য-কারণ নীতির উপর ভিত্তি করে বুদ্ধ চার আর্যসত্য আবিষ্কার করেছেন এবং এ চার আর্যসত্যের চতুর্থ সত্য-দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাকে বুদ্ধ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম পথ আখ্যায়িত করেছেন। এটাই বুদ্ধের ধর্মের মূলতত্ত্ব।

তারপর দ্বাদশ আয়তন ক্রমে জগতের অনন্ত দুঃখরাশির উদয় বিলয় চিন্তা করতে করতে বিমুক্তি সুখ উপভোগ করলেন। প্রথম সপ্তাহ বোধি পালঙ্কে, দ্বিতীয় সপ্তাহ অনিমেষ নেত্রে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে, তৃতীয় সপ্তাহ চংক্রমণে, চতুর্থ সপ্তাহ রত্নঘরে, পঞ্চম সপ্তাহ অজপাল নিগ্রোধমূলে, ষষ্ঠ সপ্তাহ মুচলিন্দমূলে এবং সপ্তম সপ্তাহ রাজায়তন বৃক্ষমূলে- এই সাত সপ্তাহ বিমুক্তি সুখ অনুভব করেন। রাজায়তন বৃক্ষমূলে বণিক তপস্সু ও ভল্লিকের শ্রদ্ধা প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে বুদ্ধ ও ধর্মের শরণাপন্ন করেন। অতঃপর তিনি নৈরঞ্জনা নদীতীরে অজপাল নিগ্রোধমূলে ধ্যানাসনে বিমুক্তি রস উপভোগের পর সমাধি হতে উঠে এরূপ বললেন-

কিচ্ছেন যে অধিগতং হলং দানি পকাসিতুং
রাগ দোস পরেতেহি নায়ং ধম্মে সুসুম্বুধো,
পটিসোত গামিং নিপুণং গভীরং দুদ্দসং অনুং
রাগরত্তা ন দক্খন্তি তমোক্খন্ধেন অব্বুটা'তি।"[৬২]

অর্থঃ কৃচ্ছ তপস্যায় আমি যে সম্বোধি অধিগত হয়েছি, তা সুনিপুণ, গভীর দুর্বোধ্য এবং অতি সুক্ষ্ম। অবিদ্যার তিমিরে আচ্ছন্ন কামক্রোধাসক্ত মানবের নিকট এ ধর্ম কখনও সুবোধ্য হবেনা।

সংসারের কুলগামী শ্রোতাগণ যদি এর মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে তবে আমার দেশনার প্রয়োজন নেই। মহাব্রহ্মা প্রমুখ দেবতা ভগবান তথাগতের এরূপ মনোভাব জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন এবং মনে করলেন- তাহলে তো জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মুত্যুর কবল থেকে জগতের জীবগণ উদ্ধার হতে পারবেনা। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব নিরর্থক হয়ে যাবে। অতএব সহম্পতি মহাব্রহ্মা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন-

অপারুতা তেসং অমতস্স দ্বারং
যো সোতবন্তো পমুঞ্চন্তু সদ্ধং।[৬৩]

হে বিমল বুদ্ধ! অমৃতের দ্বার উন্মোচন করুন, আপনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধর্ম সকলে শ্রবণ করুক।

মহামতি ভগবান বুদ্ধ মহাব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় ধর্মপ্রচার করতে উৎসাহিত হয়ে ভাবলেন- সে শ্রেষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তি কে যিনি আমার ধর্মদেশনার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন? তখন মনে হলো আরাড় কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের কথা। যাঁদের নিকট গৃহত্যাগের পর সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগনীতি শিক্ষা করেছিলেন। ধ্যানস্থ হয়ে দিব্যচক্ষে দেখলেন, তাঁরা উভয়ে কালগত হয়েছেন। তারপর মনে পড়ল পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কথা, যাঁরা একসময় তাঁর সহচর ছিলেন। অতএব সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের কাছেই সর্বপ্রথম তাঁর নবধর্ম প্রচার করবেন বলে স্থির করলেন এবং ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন, তাঁরা বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে (বর্তমান সারনাথ) তপস্যায় রত আছেন। অনন্তর ভগবান বুদ্ধ তাঁদের অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিছুদূর গিয়ে এক বৃক্ষের ছায়াতলে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় উপক নামক এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। তথাগতের দিব্যজ্যোতি ও সাম্য মূর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আয়ুষ্মান! আপনি কার শিষ্য? এই আশ্চর্য পবিত্র ব্রহ্মচর্য কোথায় শিখলেন? ভগবান তথাগত উত্তর দিলেন-

''ন মে আচরিয়ো অত্থি সদিসো যেন বিজ্জতি,
সদেব কস্মিং লোকস্মিং নত্থি মে পটিপুগ্গলো।
অহং'হি অরহা লোকে অহং সত্তা অনুত্তরো,
একোম্হি সম্মাসমুদ্ধো, সীতিভূতেস্মি নিব্বুতো।''[৬৪]

A_t আমার অধিগত নির্বাণ ধর্মের কোন শিক্ষক বা আচার্য নেই, আমার সদৃশ কোন ব্যক্তিও নেই। আমি অর্হৎ, অনুত্তর শাস্তা, আমি চতুরার্য সত্য দর্শন করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছি। আমার কলুষরাশি চিরতরে নির্বাপিত হয়েছে বলে আমি পরিনিবৃত। উপক তথাগতের উক্তি শ্রবণ করে সম্ভাষণান্তে চলে গেলেন।

gnvcwiwbevY

মহামতি ভগবান গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫৮৯ বা ৫২৮ অব্দে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর পঁয়তাল্লিশ বছর যাবত সকল প্রাণীর হিতসাধন কল্পে রাজা, মহারাজা, ব্রাহ্মণ, ধনী, দরিদ্র-জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের নিকট সদ্ধর্ম প্রচার করেন এবং আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। বিভিন্ন পন্ডিতদের মতামত অনুসারে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা হলো-[৬৫]

কানিংহাম	৪৭৮ খ্রিঃপূঃ
ম্যাক্সমুলার	৪৭৭ খ্রিঃ পূঃ
সিংহলীমত	৫৪৩ খ্রিঃ পূঃ
ভিন্সেন্ট স্মিথ	৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ
ফ্লিট	৪৮৩ খ্রিঃ পূঃ

ঊনাশি বছর বয়সে মহামতি ভগবান গৌতম বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। বৈশালীর বৃজীদের বিরুদ্ধে রাজা অজাতশত্রু তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রাজা অজাতশত্রু তাঁর পরিকল্পনা জানানোর জন্য মহামতি বুদ্ধের কাছে মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে পাঠালেন। বর্ষকার ব্রাহ্মণ মহামতি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমনের কারণ জানালেন। ভগবান বুদ্ধ বললেন- 'যতদিন বৃজী তাদের সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম পালন করবে ততদিন তারা অপরাজেয় থাকবে এবং তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে।' ভগবান বুদ্ধ আরও বললেন- 'এই সপ্ত অপরিহানিয় নীতি কেবল গণতন্ত্রমূলক বৃজীদের মঙ্গলের জন্যই প্রযোজ্য নয়, এটা সমগ্র মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে।[৬৬] ভগবান বুদ্ধ বৃজীদের মধ্যে প্রচলিত সপ্ত অপরিহানিকর ধর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে ৪১টি শাসন পরিহানিকর ধর্মের উল্লেখ করেন।[৬৭] এই প্রসঙ্গে তিনি ভিক্ষু সংঘের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে বিবিধ অপরিহানিকর ধর্মের উপদেশ প্রদান করলেন।

এরপর ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ হতে আম্রলট্‌ঠিকায় উপনীত হলেন। ভিক্ষুসংঘকে ধর্মোপদেশ দিয়ে তিনি সেখান থেকে নালন্দায় যান। সেখানে স্থানীয় প্রাবারিক আম্রকুঞ্জে শারীপুত্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং অনেক ধর্মালোচনা হয়। নালন্দা হতে ভগবান বুদ্ধ সশিষ্যে পাটলি গ্রামে অর্থাৎ পাটনায় এসে সেখানকার অতিথিশালায় অবস্থান করেন। এখানে তিনি সমবেত জনতাকে শীলভঙ্গের পরিণাম ও শীল পালনের গুরুত্বের কথা বর্ণনা করেন। সেসময় সুনীধ ও বর্ষকার নামক মগধের দুই মহামাত্য বৃজীদের আক্রমণ নিবারণকল্পে পাটলিগ্রামে একটি নগর নির্মাণ করছিলেন। এটা শুনে ভগবান বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেন- 'সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে এই নগর শ্রেষ্ঠতম হবে কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্বিবাদের মাধ্যমে এই নগরী ধ্বংসের সম্ভাবনা রয়েছে।' মন্ত্রীদ্বয় সশিষ্যে ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে নগর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করলেন। ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত যেই দ্বারে তিনি গমন করেন তার নাম 'গৌতমদ্বার' এবং যেই ঘাট দিয়ে তিনি গঙ্গা নদী পার হলেন সেটার নাম 'গঙ্গাতীর্থ' নামকরণ করা হল। তৎকালীন সময়ে গঙ্গা নদী জলে পরিপূর্ণ ছিল। ভগবান ঋদ্ধিবলে সশিষ্যে গঙ্গার এই তীরে অন্তর্হিত হয়ে পরতীরে আবির্ভূত হলেন। গঙ্গার তীর হতে কোটি গ্রামে উপনীত হয়ে 'আর্যসত্য' সম্পর্কে সকলকে ধর্মোপদেশ দিলেন। আর্যসত্য ভগবান বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ প্রদানকালে ভগবান চার আর্যসত্যই দেশনা করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের পঁয়তাল্লিশ বছর যাবত তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন আকারে এই চার আর্যসত্য দেশনা করেছেন। তাই বলা হয়েছে- "চতুসচ্চবিনিম্মুত্তং ধম্মং নাম নত্থি।"

অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপিটক এই চার আর্যসত্যের বিস্তৃত বর্ণনা মাত্র। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে যারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ তাঁরাই বলেন যে, কেবল দুঃখবাদই বুদ্ধের ধর্মের মূলকথা। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের ধর্ম হচ্ছে 'দুঃখান্তবাদ' '(দুঃখোপশমবাদ)'।

কোটিগ্রাম থেকে ভগবান এসে পৌঁছলেন নাতিকায়।[৬৮] নাতিকায় ভগবান বুদ্ধ 'ধম্মাদাস' অর্থাৎ ধর্মের বা সত্যের মুকুর নামক ধর্ম পর্যায় দেশনা করেন। মুকুর গ্রহণে যেমন স্বীয় মুখাবয়ব প্রকৃষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায়, এই ধর্মের মুকুর অনুসরণ করলেও প্রত্যেক ব্যক্তিই সেরূপ নিজ নিজ ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হতে পারে। ভগবান বৈশালীতে এসে আম্রবনে অবস্থান করছেন শুনে আম্রপালী গণিকা ভগবদ্দর্শনে এসে তাঁকে ভিক্ষুসংঘ সহ পর-দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। পরে লিচ্ছবীগণ এসে পর-দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করতে চাইলে ভগবান তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি পূর্বেই আম্রপালীর

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। উপায়ান্তর না দেখে লিচ্ছবীগণ আম্রপালীকে নানাভাবে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ঐ নিমন্ত্রণ তাঁদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু আম্রপালী রাজী হলেন না। পরের দিন আম্রপালী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্যেভোজ্য দিয়ে স্বহস্তে সন্তর্পিত করলেন। ভোজনাবসানে আম্রপালী ভগবানকে এরূপ নিবেদন করলেন- 'ভন্তে, আমি এই আম্রকুঞ্জ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করছি।' অনন্তর ভগবান আম্রপালীকে যথোচিত ধর্মকথার উপদেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে বেলুব গ্রামে[৬৯] চলে গেলেন। বেলুবগ্রামে এসে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করে বললেন- ''আমি বেলুব গ্রামে বর্ষাবাস[৭০] যাপন করব। তোমরা বৈশালীর চতুপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে নিজ নিজ মিত্র পরিচিত বন্ধু ভিক্ষুগণের সঙ্গে থেকে বর্ষাবাস উদযাপন কর।'' ভগবান বুদ্ধ বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস উদযাপন করলেন। এটাই তাঁর শেষ বর্ষাবাস উদযাপন[৭১]। বর্ষাবাসের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্মৃতি ও সহিষ্ণুতার সাথে এ যাত্রায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন। আনন্দ স্থবির ভগবানের রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা এবং আরোগ্য হেতু স্বস্তি নিবেদন করলেন। ভগবান সহাস্যবদনে আশ্বাস দিয়ে বললেন- ''আনন্দ, ভিক্ষুসঙ্ঘ আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা করে! যা শিক্ষা দেওয়ার দিয়েছি, ভিক্ষুসংঘ আমাকেই পরিচালনা করতে হবে সে নেতৃত্বের দাবী বুদ্ধগণ করেন না। সুতরাং তাঁদের অবর্তমানে ভিক্ষুদিগকে কে পরিচালনা করবেন সে আশঙ্কাও আর তাঁদের থাকেনা।'' ভগবান বুদ্ধ আরো বললেন-

''অত্তদীপা বিহরথ অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা,
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা'তি।''[৭২]

অর্থাৎ, ''তোমরা নিজেরাই নিজেদের দ্বীপ বা আশ্রয়স্থল। নিজেরাই নিজেদের শরণ হয়ে অবস্থান কর। অন্য কারো শরণ নিওনা। ধর্মদ্বীপ ও ধর্মাশ্রিত হয়ে বিহার কারো।'' বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস যাপন করে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীতে না ফিরে পুনরায় শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তাঁর অগ্রশাবক ধর্মসেনাপতি শারীপুত্র পরিনির্বাণের জন্য বিদায় নিলেন। এই বিদায় দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক। কার্তিকী পূর্ণিমার দিন তিনি নিজের জন্মস্থানেই পরিনির্বাণ লাভ করেন। শারীপুত্রের ভ্রাতা চুন্দ স্থবির কর্তৃক শারীপুত্রের অস্থিধাতু শ্রাবস্তীতে আনীত হলে শ্রাবস্তীতেই সেগুলোর উপর ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবন হতে রাজগৃহে আগমন করলেন। সেখানে অগ্রশ্রাবক মৌদ্গল্যায়নেরও পরিনির্বাণ হয়। শারীপুত্রের পরিনির্বাণের এক পক্ষকাল পরে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের অমাবস্যায়। ভগবান

মৌদ্‌গল্যায়নের অস্থিধাতু আহরণ করে ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করে[৭৩] গঙ্গা ও উক্কাচেলা[৭৪] হয়ে পুনরায় বৈশালীর মহাবনে কুটাগারশালায় আগমন করলেন। পরের দিন ভগবান বুদ্ধ পূর্বাহ্নের সময় বৈশালী নগরে পিন্ডাচরণ করে পিন্ডপাতান্তে কুটাগারশালায় এসে আহারকার্য শেষ করে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন- ''আনন্দ, চল চাপালচৈত্যে যাব।'' আনন্দ ভগবান বুদ্ধের বসার আসন নিয়ে ভগবানের সঙ্গে চাপালচৈত্যে উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁর জন্য বিস্তৃত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে অভিবাদন করে এক পাশে উপবেশন করলেন। ভগবান বুদ্ধ বললেন- ''হে আনন্দ! রমণীয় বৈশালী, রমণীয় ইহার উদেন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপুত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য এবং এই চাপাল-চৈত্য। হে আনন্দ! তথাগতের চার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত , রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তুভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হয়েছে। আনন্দ! সেজন্য ইচ্ছা করলে তথাগত কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষ অবস্থান করতে পারেন।'' কিন্তু আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক এরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হলেও, স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হলেও বুঝতে সক্ষম হলেন না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন না যে, ''ভন্তে, ভগবান, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের হিত সুখের জন্য কল্পকাল অবস্থান করুন।'' কেননা তাঁর চিত্ত মারের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল। মার ভীষণ-রূপ দেখিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবানের কথার তাৎপর্য বুঝানোর অবকাশ দেয়নি। ভগবান দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও আনন্দকে অনুরূপভাবে বললেন। কিন্তু মারের মাধ্যমে অভিভূত[৭৫] আনন্দ ভগবান বুদ্ধের কথার মর্মার্থ বুঝতে পারলেন না। তখন ভগবান আনন্দকে বললেন- ''আনন্দ, এখন তুমি যথেচ্ছা গমন কর।'' 'সাধু ভন্তে' বলে আনন্দ ভগবানের কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে নিকটস্থ অন্য একটি বৃক্ষমূলে গিয়ে বসলেন।

এদিকে ধার্মিকদের শত্রু মার এসে ভগবান বুদ্ধকে বললেন- ''হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হোন। ভন্তে, এখন আপনার পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।'' ভগবান বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন- 'পাপমতি, যতদিন আমার চার পরিষদ (ভিক্ষু শ্রাবকগণ, ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ, গৃহী উপাসকগণ এবং গৃহী উপাসিকাগণ) সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ ও বহুশ্রুত না হয়, যতদিন তাঁরা সদ্ধর্মকে সংবিভাগ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করে অন্যদের বুঝাতে দক্ষতা লাভ করতে না পারে এবং যতদিন তারা অপরের মিথ্যা অপবাদ ধর্মত সুনিগ্রহ করে পাপবিতারক, পাপনাশক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হয় ততদিন আমি পরিনির্বাপিত হব না।' কিন্তু ভন্তে, এখন আপনার চার পরিষদ আপনি যেরূপ চাইছেন সেরূপভাবেই

সুদক্ষ হয়েছে। অতএব ভন্তে, ভগবান, এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন। ভন্তে, ভগবানের পরিনির্বাণের যথোচিত সময় হয়েছে।''

এরূপ উক্ত হলে পাপমতি মারকে ভগবান বললেন- ''হে পাপমতি, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও, অচিরেই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে। অদ্য হতে তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হবেন।[৭৬] অনন্তর ভগবান চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও জ্ঞানযোগে আয়ুসংস্কার বর্জন করলেন[৭৭] অর্থাৎ এখন হতে তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণবায়ু চলতে থাকুক, তারপর নিরুদ্ধ হোক বলে অধিষ্ঠান করলেন। ভগবান আয়ুসংস্কার বর্জন করলে ভীষণ লোমহোর্ষক ভূমিকম্প আরম্ভ হল, দেব-গর্জন শ্রুত হল, অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হল, ঘন বৃষ্টি বর্ষিত হল।

ভীষণ ভূমিকম্প অনুভব করে আয়ুষ্মান আনন্দ দ্রুতগতিতে ভগবানের কাছে এসে এই ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান বললেন- ''হে আনন্দ, ভূমিকম্পের অষ্টবিধ হেতু ও অষ্টবিধ প্রত্যয় আছে।[৭৮] যথা-

(১) যখন প্রাকৃতিক কারণে ধাতুক্ষোভ হয়, অর্থাৎ মহাপৃথিবী, জল এবং মহাবায়ু সংক্ষুব্ধ হয় তখন ভূমিকম্প হয়।

(২) কোন ঋদ্ধিমান শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বা মহানুভব দেবের ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।

(৩) ভাবি বুদ্ধ তুষিতস্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করলে ভূমিকম্প হয়।

(৪) ভাবীবুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হলে ভূমিকম্প হয়।

(৫) যখন তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেন, তখন ভূমিকম্প হয়।

(৬) যখন তথাগত অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

(৭) যখন তথাগত আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

(৮) যখন তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন তখন ভূমিকম্প হয়।

এভাবে ভগবান বুদ্ধ ভূমিকম্পের অষ্টবিধ কারণ সম্বন্ধে আনন্দকে জানিয়ে প্রকাশ করলেন যে, তিনি তাঁর আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিয়েছেন এবং তিনমাস পরে পরিনির্বাণ লাভ করবেন। আয়ুষ্মান আনন্দ তথাগতের পরিনির্বাণ সংকল্প অবগত হয়ে বহুজনের হিত ও সুখার্থে কল্প বা কল্পাবশিষ্ট কাল অবস্থান করার জন্য তথাগতকে অনুরোধ করলেন। ভগবান দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তথাগত বললেন যে

ইতিপূর্বে তিনি বহুবার বিভিন্ন ভাবে আনন্দকে জানিয়েছেন যে, তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল বা কল্পাবশিষ্ট কাল এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু আনন্দ ভগবানের কথা বুঝতে পারেন নি। কারণ তিনি প্রতিবারই মারের দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। তারপর ভগবান বৈশালীর সকল ভিক্ষুকে একত্রিত করে বললেন- ''ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয়[৭৯] ধর্মের উপদেশ দিয়েছি। সেটা শিক্ষা করে আচরণ করবে, অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করবে, স্বীয় জীবনে প্রতিভাত করবে, তাহলে এই শাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। ভিক্ষুগণ, জাগতিক সকল পদার্থই অনিত্য। অপ্রমত্তভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন কর। তথাগত অচিরে তিনমাস পরে পরিনির্বাপিত হবেন।''

অনন্তর ভগবান বৈশালীতে কিছুকাল অবস্থান করে ভন্ডগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে বৈশালীর দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন- ''আনন্দ, বৈশালীর প্রতি তথাগতের এই অন্তিম দর্শন।'' ভগবান যথাক্রমে ভন্ডগ্রাম, হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম ও জম্পুগ্রাম ঘুরে ভোগনগরে আসলেন। ভোগনগরস্থ আনন্দ চৈত্যে ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিলেন- "হে ভিক্ষুগণ, শীলপরিভাবিত সমাধি, সমাধি-পরিভাবিত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত-চতুর্বিধ আস্রব[৮০] হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।'' ভোগনগর হতে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যবহারে পাবায় এসে স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করতে লাগলেন। চুন্দ এই সংবাদ শুনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করলেন। উত্তম খাদ্যভোজ্যসহ প্রচুর ''সূকরমদ্দব''[৮১] দিয়ে দানকার্য সম্পাদন করা হল। কেবল ভগবানই ''সূকরমদ্দব'' গ্রহণ করলেন এবং অন্যদের তা পরিবেশন করতে তিনি নিষেধ করলেন। ভোজনান্তে ভগবান বুদ্ধ চুন্দকে ধর্মোপদেশ দিয়ে সুপ্রসন্ন করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সাংঘাতিক রক্তামাশয় দেখা দিল। মরণান্তিক বেদনা অসীম ধৈর্য সহকারে সহ্য করে তিনি কুশীনগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর শ্রান্তি বিনোদনের জন্য এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করে জলপান করলেন। সেখানে আরাড় কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁর পূর্ব ধর্মমত পরিহার পূর্বক ত্রিশরণাগত উপাসক হলেন। শরণাগত উপাসকদের মধ্যে মল্লপুত্র পুক্কুসই ভগবানের অন্তিম উপাসক। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ককুধা নদীতে গমন করলেন। সেখানে স্নান ও জলপান করে নদীতীরস্থ আম্রকুঞ্জে উপবেশনপূর্বক বললেন- ''আনন্দ দ্বিবিধ অন্ন যাঁরা তথাগতকে দান করেছেন তাঁরা ভাগ্যবান- সেই অন্ন আহার করে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছেন (বর্তমান ক্ষেত্রে সুজাতা) এবং যেই অন্ন আহার করে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্বাণে নির্বাপিত হবেন (বর্তমান ক্ষেত্রে স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ)। এটা তুমি স্বর্ণকার পুত্র চুন্দকে বলবে।''

পাবা হতে কুশীনগরের দূরত্ব মাত্র দেড় যোজন। ভগবান মধ্যাহ্নে যাত্রা শুরু করে সূর্যাস্তের সময় কুশীনগরে পৌঁছলেন। পথিমধ্যে তিনি কয়েকবার বিশ্রাম নিলেন। হিরণ্যবতী নদীর অপরতীরে কুশীনগরে মল্লদের শালবন। সেখানে যুগ্মশাল বৃক্ষমূলে সুসজ্জিত মঞ্চে তথাগত শয়ন করলেন। এখানে তিনি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিবর্গের দর্শণীয় ও সংবেগজনক চার তীর্থ স্থান,[৮২] নারী জাতির সাথে ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবহারবিধি, তথাগতের দেহ সৎকারের বিধি, স্তূপের যোগ্য ব্যক্তি[৮৩] ও তার কারণ, আনন্দকে সান্ত্বনাদান, জগতের সবকিছুই অনিত্যও পরিবর্তনশীল- এ সকল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কোন হিতৈষী পিতা যেমন ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য পুত্রগণকে নানাভাবে উপদেশ দেন, তথাগতের এই উপদেশবাণীও তদ্রুপ কালোপযোগী ও হৃদয়গ্রাহী। তারপর তিনি আনন্দকে বললেন- 'আনন্দ, তুমি মহাপুণ্যবান। মহোদ্যমে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। তুমি অচিরেই আস্রবমুক্ত অর্হৎ হবে।' ভগবান এই প্রসঙ্গে আনন্দের সেবা, সময়ের সদ্ব্যবহার, জ্ঞান এবং রাজচক্রবর্তীর মত চতুর্বিধ অত্যাশ্চর্য গুণ[৮৪] সম্পর্কে প্রশংসা করলেন। এরূপ উক্ত হলে আনন্দ ভগবান বুদ্ধকে সম্বোধন করে নিবেদন করলেন- ''ভন্তে ভগবান, এই ক্ষুদ্র, বিষম শাখানগরে পরিনির্বাপিত হবেন না। ভন্তে, আরো বহু মহানগর আছে, যথা- চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা), কোশাম্বী, বারাণসী- এগুলোর মধ্যে যে কোন স্থানে ভগবান পরিনির্বাপিত হোন। এই সব স্থানে বহু ক্ষত্রিয় মহাশাল, ব্রাহ্মণ মহাশাল ও গৃহপতি মহাশাল তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্ন, তাঁরা তথাগতের শরীর পূজা করবেন।''তদুত্তরে ভগবান বুদ্ধ কুশীনগরের প্রাক্তন মাহাত্ম্য কীর্তন করতে 'মহাসুদস্সন সুত্ত'[৮৫] বর্ণনা করলেন এবং আনন্দকে বললেন- যাও আনন্দ, তুমি কুশীনগরে প্রবেশ করে কুশীনগরবাসী মল্লরাজগণকে জ্ঞাপন কর যে, অদ্য রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের মহাপরিনির্বাণ হবে। তাঁরা যেন এসে তথাগতকে শেষ বারের মত দর্শন করেন, তা না হলে পরে অনুতাপ করতে হবে। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশকে শিরোধার্য করে পাত্রচীবর নিয়ে সহচরসহ কুশীনগরে প্রবেশ করলেন এবং মল্লরাজগণকে ভগবানের কথা জানালেন। অনন্তর মল্লরাজগণ তথাগতের আসন্ন পরিনির্বাণ-বার্তা শুনে দলে দলে এসে শেষবারের মত তথাগতকে দর্শন ও বন্দনা করলেন। এর মধ্যে সুভদ্র নামক এক সন্ন্যাসী ভগবানের কাছে এসে ভগবান বুদ্ধের ধর্মকথায় মুগ্ধ হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করলেন এবং পূর্ব জন্মের পুণ্যপারমিতা প্রভাবে অর্হত্ব লাভ করলেন। আর ইনিই হচ্ছেন ভগবানের অন্তিম সাক্ষাত ভিক্ষু-শিষ্য। বৈশাখী পূর্ণিমা। নিশি অবসান প্রায়। নিস্তব্ধ ধরণী। সহসা প্রকৃতির নিরবতা ভঙ্গ করে ধ্বনিত হল- ''আনন্দ, তথাগতের অবর্তমানে তোমরা মনে করোনা- আমাদের শাস্তা নেই, আমাদের শিক্ষাগুরু অন্তর্হিত হয়েছেন। তথাগত যে ধর্ম-বিনয় তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, এটাই তোমাদের শিক্ষাগুরু। তথাগতকে তোমরা যেরূপে সম্মান ও সম্বোধন করতে

অতঃপর কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সেরূপই করবে। জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কণিষ্ঠ ভিক্ষকে 'আবুসো' (বন্ধু) বলে সম্বোধন করবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্তন করতে পারবে। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ অথবা আর্যমার্গ সম্বন্ধে কারও কোন সংশয় থাকলে এখন জিজ্ঞেস করতে পারো।'' এক্ষেত্রে সকলে নীরব থাকল। কারণ তাঁদের সব কনিষ্ঠ ভিক্ষুও স্রোতাপন্ন ছিলেন। ভগবান বুদ্ধ পুনরায় বললেন- ''ভিক্ষুগণ যৌগিক পদার্থ মাত্রই ভঙ্গুর ক্ষয়শীল। অপ্রমত্তভাবেই স্বকার্য সম্পাদন কর।''- এটাই তথাগতের অন্তিম বাণী।[৮৬]

প্রাচীনকালের রাজচক্রবর্তী মহাসুদর্শন রাজার রাজধানী কুশীনগরের মল্লদের শালবনে অন্তিম শয্যায় শায়িত বুদ্ধের পরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্তে তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সেবক আনন্দকে অশ্রুজল ফেলতে দেখে তাঁকে উপদেশ স্বরূপ বলেন:

'অলং আনন্দ, মা সোচিত্থ, মা পরিদেবিত্থ। ননু এতং আনন্দ, ময়া পটিকচ্চেব অক্খাতং সব্বে' হেব পিযেতি মনাপেহি অঞ্ঞথভাবো নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো'।

অর্থঃ আনন্দ, তোমরা অধীর হবে না, রোদন করবেন না। যেসব পার্থিব বস্তু আমাদের প্রিয়, মনোজ্ঞ তাদের ধর্মই এটা যে আমরা তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো- তা আগে বলিনি?

এরূপ উক্তি করে ভগবান বুদ্ধ নীরব, ধ্যান-পরায়ণ হলেন। ধ্যানের স্তরের পর স্তরে অধিরোহণ করে সর্বোচ্চতম সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন হলেন। এই অবস্থায় মৃতদেহের সাথে ধ্যানপরায়ণ যোগীর আয়ু এবং দৈহিক উষ্ণতা ব্যতীত বাহ্যিক কোন বৈষম্য প্রতীয়মান হয়না। উৎকণ্ঠিত হয়ে আনন্দ স্থবির অনুরুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন- "প্রভু অনুরুদ্ধ! ভগবান বুদ্ধ কি পরিনির্বাপিত হয়েছেন?" তদুত্তরে অনুরুদ্ধ বললেন- "না বন্ধু! তথাগত সংজ্ঞাবেদয়িত-নিরোধ-সমাপন্ন হয়েছেন।'' ভগবান বুদ্ধ আবার নিরোধ-সমাপত্তি হতে উত্থিত হয়ে ধ্যানের নিম্নস্তরে অবরোহণ করতে করতে চতুর্থ ধ্যানে আরোহণ করলেন। এই চতুর্থ ধ্যানেই তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণে পরিনির্বাপিত হলেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হল। পূজনীয় অনুরুদ্ধ, সমবেত জনতা এবং ভিক্ষুসংঘ ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণ সম্পর্কে ঘোষণা করে বললেন- ''বন্ধুগণ! প্রস্থিতচিত্ত তথাগতের এখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধমুনি নির্বাণ শান্তি উপলক্ষে কালক্রিয়া করেছেন। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেছেন। প্রদীপের শিখা নিঃশেষের মত তাঁর চিত্তের বিমোক্ষ হল'' এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা খ্রী: পূ: ৫৪৪ অব্দে সংঘটিত হয়।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের ঘোষণাবাণী হতে নির্বাণের অবস্থা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। প্রদীপ দীপ্তমান। সলিতা তার আসন্ন এবং প্রধান কারণ, তেল অপরিহার্য সহকারী। তেলের অভাব হলে সলিতা বেশীক্ষণ দীপ শিখা অক্ষুন্ন রাখতে পারেনা। প্রদীপ নিজে নিজেই নিভে যায়। তাই এই দীপ-নির্বাণের সাথে জীবন নির্বাণের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। শাস্ত্রে এ জাতীয় উপমা প্রায়শ দৃষ্ট হয়। কবি অশ্বঘোষ তাই নির্বাণ সম্বন্ধে বলেছেন:

‘দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্।
দিশং ন কঞ্চিৎ বিদিশং ন কঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নিবৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনীং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম্
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্।[৮৮]

ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলে অবীতরাগ ভিক্ষুগণ ভূতলে পতিত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। বীতরাগ স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাশালী ভিক্ষুগণ বললেন- ‘‘সংযোগজ অর্থাৎ যৌগিক পদার্থমাত্রই অনিত্য, অতএব ভগবানের রূপকায় কিরূপে স্থায়ী হবে?’’ অনন্তর স্থবির অনুরুদ্ধ আনন্দকে বললেন, ‘‘বন্ধু আনন্দ, কুশীনগরে প্রবেশ করে মল্লরাজগণকে বলো, ভগবান বুদ্ধ মহারিনির্বাণ লাভ করেছেন।’’ তদনুসারে আনন্দ কুশীনগরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, তাঁর মুখে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের সংবাদ শুনে মল্লবাসীগণ বিভিন্নভাবে শোক প্রকাশ করলেন। অনন্তর তাঁরা কুশীনগরের উপবর্তনে শালবনে নগম করে নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দিয়ে ক্রমান্বয়ে সাতদিন ভগবানের দেহের পূজা করলেন। সপ্তম দিবসে তাঁরা স্থির করলেন, ‘‘আমরা ভগবানের দেহ বিবিধ বাদ্যযন্ত্রবাদন সহকারে নৃত্য, গীত ও মাল্য এবং সুগন্ধাদি দিয়ে সৎকার, গৌরব, মান ও পূজা করতে করতে নগরের বাইরে, নগরের দক্ষিণ হতে দক্ষিণে অর্থাৎ যমকশালবৃক্ষের মূল হতে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে নগরের দক্ষিণে দাহ করব।’’ তখন আটজন মহাশক্তি সম্পন্ন মল্লপ্রধান ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করে নতুন বস্ত্র পরিধান করলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য তারা ভগবানের দেহ কাঁধে উঠাতে পারলেন না। তখন তাঁরা স্থবির অনুরুদ্ধকে এটার কারণ জিজ্ঞেসা করাতে তিনি বললেন- ‘‘হে বাসিষ্টগণ, আপনাদের অভিপ্রায় একরূপ,

দেবগণের অভিপ্রায় অন্যরূপ, তাই এরূপ হচ্ছে। দেবগণের ইচ্ছা হল, তাঁরা ভগবান বুদ্ধের দেহ যমকশালবৃক্ষের মূল হতে উত্তরে, উত্তরে নগরের উত্তর দিয়ে নিয়ে গিয়ে, উত্তর দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ করিয়ে নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করবেন এবং পূর্বদ্বার দিয়ে নগর হতে বের করে নগরের পূর্ব পাশে অবস্থিত মল্লরাজাদের মুকুট বন্ধন নামক অভিষেক মন্ডপে ভগবানের দেহ সৎকার করবেন।'' তখন মল্লরাজাগণ বললেন, ''ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় অনুসারেই সৎকার করা হোক।''

সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলেন যে, শালবন হতে আরম্ভ করে সমগ্র কুশীনগর দিব্য মন্দার পুষ্পে আচ্ছাদিত হয়েছে। দেবগণের ইচ্ছানুসারে মহাসমারোহের সাথে ভগবান বুদ্ধের দেহ কুশীনগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করা হল। তখন সেনাপতি বন্ধুল মল্লের স্ত্রী মল্লিকাদেবী স্বীয় মহালতাপ্রসাধন খুলে পরিষ্কার করে গন্ধোদকে ধৌত করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। দরজার কাছে ভগবান বুদ্ধের দেহ আনা হলে বললেন, ''বৎসগণ, একটু নামাও, আমি শাস্তাকে পূজা করব।'' ভগবান বুদ্ধের দেহ নামানো হলে মল্লিকাদেবী স্বয়ং চার কোটি মূল্যের মহালতা-প্রসাধন ভগবান বুদ্ধের দেহে পরিয়ে দিলেন। আর তা ভগবানের মস্তক হতে পদতল পর্যন্ত পরিহিত হল। ভগবানের সুবর্ণ বর্ণদেহ সপ্ত রত্নময় আভরণ পরিহিত হওয়ায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করল। তা দেখে মল্লিকাদেবী প্রার্থনা করলেন, ''ভন্তে, যতদিন আমি সংসারবর্তে সংসরণ করি, ততদিন আমার পৃথক কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন না হোক, আমার শরীর নিত্য মহালতা-প্রসাধন পরিহিত সদৃশ হোক।''

অতঃপর ভগবান বুদ্ধের দেহ উঠিয়ে পূর্বদ্বয় দিয়ে নগর হতে বের করে নগরের পূর্ব পাশের মুকুট বন্ধনে এনে সেখানে স্থাপন করা হল। তারপর মল্লরাজগণ স্থবির আনন্দের নির্দেশনানুসারে ভগবানের দেহ সূক্ষ্ম নতুন বস্ত্র দিয়ে আবৃত করে তার উপর সুধুনিত কার্পাস দিয়ে আবৃত করলেন। এভাবে পাঁচশত বার বস্ত্র ও কার্পাস দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করা হল। তারপর একটি তেলপূর্ণ লোহার পাত্রে ভগবানের দেহ স্থাপন করে অন্য একটি লোহার পাত্র দিয়ে তা আবৃত করলেন এবং সর্ববিধ সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে (উত্তর-দক্ষিণে ১২০ হাত এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১২০ হাত) পরিমিত চিতা তৈরি করে তেলপূর্ণ আধার সহ ভগবান বুদ্ধের দেহ চিতার উপর আরোপিত করলেন। তারপর মল্লদের মধ্যে চারজন প্রধান মল্ল চিতায় অগ্নি সংযোগ করতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হলেন। মল্ল রাজন্যবর্গ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ''আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পাবা হতে কুশীনগরে আসছেন। তাঁর সঙ্গে পাঁচশত ভিক্ষুও আছেন। যতক্ষণ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এসে ভগবান বুদ্ধের পদে মস্তক স্থাপন করে বন্দনা না করেন ততক্ষণ

ভগবানের চিতা প্রজ্জ্বলিত হবেনা।'' এটা শুনে সকলে অধীর আগ্রহে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের কুশীনগরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ভিক্ষুসংঘ সহ মহাকাশ্যপ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি উত্তরাসংগ চীবর একাংশ করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বন্দনা করলেন এবং করজোড়ে তিনবার ভগবানের দেহ প্রদক্ষিণ করে ভগবানের পায়ের দিকে বসে নিজ মস্তক তথাগতের আবৃত পায়ে স্পর্শ করে অধিষ্ঠান করে বললেন, ''ভগবানের আবৃত পদদ্বয় অনাবৃত হয়ে আমার মস্তকে এসে স্থিত হোক।'' সঙ্গে সঙ্গে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভগবানের পাদদ্বয় অনাবৃত হয়ে মহাকাশ্যপের মস্তকে স্থিত হল এবং মহাকাশ্যপ বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশ হস্তদ্বয় প্রসারিত করে শাস্তার সুবর্ণ-বর্ণ পাদদ্বয় মস্তকে জড়িয়ে ধরে বন্দনা করলেন। তাঁর সঙ্গে আগত পাঁচশত ভিক্ষুও অনুরূপ বন্দনা করলেন। তাঁদের বন্দনা করা শেষ হলে ভগবান বুদ্ধের চিতা নিজে থেকেই জ্বলে উঠল। ক্রমে ভগবান বুদ্ধের চর্ম, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত দগ্ধ হল, কেবল কিছু অস্থি অবশিষ্ট ছিল।[৮৯]

তৎকালীন সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু শুনলেন ভগবান বুদ্ধ কুশীনগরে পরিনির্বাণ লাভ করেছেন। তিনি কুশীনগরে দূত প্রেরণ করে বললেন, ''ভগবান বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবান বুদ্ধের শরীরের এক অংশ পেতে পারি। আমি ভগবানের দেহাবশেষ এর উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করব। এদিকে বৈশালী নগরীর লিচ্ছবীগণ দূত প্রেরণ করে বলল, ''ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পেতে পারি, আমরাও ভগবানের দেহাবশেষ এর উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করব।'' এরূপে কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, পাবার মল্লগণ সকলেই ভগবান বুদ্ধের শরীরাংশ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলেন। এক্ষেত্রে কুশীনগরের মল্লগণ বললেন, ভগবান বুদ্ধ আমাদের গ্রামে পরিনর্বাণ লাভ করেছেন, আমরা কাউকে ভগবান বুদ্ধের দেহের অংশ প্রদান করবনা। তখন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করে বললেন,

''সুণন্তু ভোন্তো মম একবাক্যং
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
ন হি সাধু অয়ম্ উত্তমপুগ্গলস্স
সরীরভঙ্গে সিয়া সম্পহারো॥
সব্বে ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোম অট্ঠ ভাগে।
বিত্থারিকা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহুজ্জনো চক্খুমতো পসন্নো'তি॥''

অর্থঃ হে মহাশয়গণ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের ভগবান বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। সেই সাধু পুরুষের দেহাবশেষ নিয়ে আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নয়। আপনারা সকলে সমবেত হোন। আমরা সানন্দে দেহাস্থিসমূহ আট ভাগে বিভক্ত করছি। সমস্তদিকে স্তূপসমূহ বিস্তারিত হোক এবং চক্ষুষ্মান লোকসকল তা দেখে প্রসন্নতা লাভ করুন।''

ব্রাহ্মণ দ্রোণের কথায় সকলে সম্মত হলেন এবং ভগবান বুদ্ধের অস্থিসমূহ আট ভাগে ভাগ করে দিলেন। তারপর দ্রোণ বললেন, ''হে মহাশয়গণ! যে কুম্ভে রেখে বুদ্ধের দেহ বিভক্ত করলাম, ঐ কুম্ভটি আমাকে দান করুন। আমি ঐ কুম্ভের উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করব।'' অনন্তর পিপ্ফলিবনীয় মৌর্যগণ দূত প্রেরণ করে বললেন, ''ভগবান বুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পেতে পারি, আমরাও ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ এর উপর স্তূপ নির্মাণ করব।'' কিন্তু দূত এসে দেখল, ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ পূর্বেই আট ভাগে বিভক্ত হয়েছে। তখন সে বুদ্ধের চিতা হতে অঙ্গার নিয়ে গেল। পিপ্ফলিবনীয় মৌর্যগণ ঐ অঙ্গারের উপর মহাস্তূপ নির্মাণ করলেন। এভাবে আটটি শরীর স্তূপ,[৯০] একটি কুম্ভস্তূপ[৯১] ও একটি অঙ্গারস্তূপ[৯২] সহ সর্বমোট দশটি স্তূপ নির্মিত হল। ভিক্ষুগণ উচ্চস্বরে বললেনঃ

''দেবিন্দনাগিন্দনরিন্দপূজিতো মনুস্সিন্দ-সেট্ঠেহি তথেব পূজিতো।
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা বুদ্ধো হবে কপ্পসতেহি দুল্লভো'তি॥''

অর্থঃ দেবরাজ, নাগরাজ, নররাজ এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিত বুদ্ধকে কৃতাঞ্জলিপুটে বন্দনা কর, শত শত কল্পেও বুদ্ধের জন্ম দুর্লভ।''

Dhaka University Institutional Repository

UxKv I Z_¨wb‡'k

১. ধর্মজীবন, ১ম খন্ড- শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ৭৫

কবিতাংশ- বুদ্ধদেব চরিত্র, গিরিশন্দ্র ঘোষ

২. গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক (জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮, ঢাকা-১০০০) পৃ. ২৫

৩. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রীর লেখা ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত ললিত বিস্তর (১৪ অধ্যায়) মতে, রাজা শুদ্ধোদন সারথির মুখে রাজকুমার সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণে যাওয়ার অভিলাষের কথা শুনে চিন্তান্বিত হলেন। তিনি সাতদিন সময় নিয়ে নগরের রাস্তাঘাট ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করালেন এবং নগরবাসীগণকে জানালেন-"কুমারের সামনে যেন কোন কুৎসিত (অর্থাৎ জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং মৃতদেহ) এসব দৃশ্য যেন চোখে না পড়ে, শুধুমাত্র মনোরম দৃশ্যই যেন রাস্তার দু'ধারে থাকে।" অতঃপর সপ্তম দিবসে রাজকুমার সিদ্ধার্থ উদ্যান-ভ্রমণে বের হলেন।

৪. ললিত বিস্তর (ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত), জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা-৬, পৃ: ১৫৬-১৫৭

৫. বোধিসত্ত্বের চার নিমিত্ত দর্শন বর্ণিত হয়েছে ললিত বিস্তরে (১৪ অধ্যায়), বুদ্ধচরিতে (৩য় অধ্যায়) এবং জাতক নিদানে।

৬. মহাবস্তু (২য় খন্ড, পৃ. ১৫৯) মতে, বোধিসত্ত্ব যেদিন মধ্যরাতে গৃহত্যাগ করেন, ঠিক ঐ সময়ে 'রাহুল' তুষিত ভবন হতে চ্যুত হয়ে মাতার কুক্ষিতে প্রবেশ করেছেন মাত্র। তাঁর জন্ম হয়নি। তিব্বতী সাহিত্যেও এটা স্বীকৃত হয়েছে যে, মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হওয়ার ছয় বছর পর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে বজ্রাসনে বোধিসত্ত্ব মারজয়ী হওয়ার মুহূর্তে রাহুল জন্মগ্রহণ করেছেন (ভদ্রকল্পাবদান, ৯ম অধ্যায়)।

৭. জাতকনিদান কথা, ধর্মপাল ভিক্ষু (কলিকাতা, ২৫০৬ বুদ্ধাব্দ), পৃ: ৬০

৮. জাতকনিদান কথা, ধর্মপাল ভিক্ষু (কলিকাতা, ২৫০৬ বুদ্ধাব্দ) পৃ: ৮৪, কিন্তু মহাবস্তু (২য় খন্ড, পৃ: ১৫৭) ও ভদ্রকল্পাবদানে (xxxv) কৃশা গৌতমীর স্থলে আনন্দের মাতা 'মৃগী' এই নামে দৃষ্ট হয়।

৯. সানন্দা, সম্পাদনা: অপর্ণা সেন, ১৯ এপ্রিল, ১৯৯০

৫ বৈশাখ, ১৩৯৭, ৪র্থ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা। শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব- অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, পৃ:২

কপিলাবস্তু হতে ২৬০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৪৩ মাইল অন্তরে অনোমা নদী অবস্থিত। অনোমা নদী বৌদ্ধদের একটি তীর্থক্ষেত্র। রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করার সময় অশ্বারোহণে তথায় গমন করেছিলেন। তাঁর পথের প্রথম নদী হল অনোমা নদী। তিনি অশ্বারোহণে এই নদী লম্ফত্যাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কপিলাবস্তু হতে রামগ্রাম ৩০ মাইল। রামগ্রাম হতে সোজা রাস্তা পাওয়া যায়না, অনেক নদীনালা ঘুরে তামেশ্বর নামক শিব মন্দিরের কাছে একটি নালা আছে। সেটি প্রায় ১৩ মাইল হবে। সেই নালার কাছে কতকগুলো বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পতিত রয়েছে। এই নদীর নাম বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। অনোমা নদীর পরিবর্তিত নাম হল কড়োয়া। যেটি আবার মঝন নামেও পরিচিত। এই নদী বর্ষার সময় অত্যন্ত প্রবল হয় কিন্তু অন্য সময়ে অতি সামান্য নদী থাকে। কার্লাইস মহোদয় এই নদীকে অনোমা নদী বলেই স্থির করেছেন। কপিলাবস্তু হতে এই নদীর দূরত্ব ঠিক ৪৩ মাইল। ললিত বিস্তর গ্রন্থ মতে, কপিলাবস্তু হতে অনোমা ৬ যোজন। ৭ মাইলে যোজন ধরা হলে ৪২ মাইল। এই অনোমা নদী পার হয়েই রাজকুমার সিদ্ধার্থ সংসার জীবনের চিহ্ন স্বরূপ রাজবেশ পরিহারপূর্বক ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করেছিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন।

১০. জাতক নিদান কথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০-৮৩

১১. জাতক নিদান কথা, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫

১২. জাতকার্থকথায় উল্লেখ আছে, তখন রাহুলের বয়স হয়েছিল মাত্র এক সপ্তাহ। কিন্তু অন্যান্য অর্থকথায় এই বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। রাহুলের জন্মদিনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন– এটাই সর্বত্র গৃহীত।

১৩. মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, ঊনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ এবং বুদ্ধত্ব লাভোত্তর বারাণসীর মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর কাছে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' সূত্রের দেশনা- মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবন ইতিহাসের ত্রি-পুণ্যস্মৃতিতে সমুজ্জ্বল এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা। এই স্মৃতিসমূহকে স্মরণে রাখার জন্য বৌদ্ধরা প্রতি বছর এই পূর্ণিমা তিথিকে অন্তরের অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পালন করে থাকে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা লগ্নেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা পালিত হয়। এছাড়া আষাঢ়ী পূর্ণিমার আর একটি বিশেষ দিক হল- এই পূর্ণিমা তিথি হতে ভিক্ষুসংঘ ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান শুরু করেন, যার সমাপ্তি ঘটে প্রবারণা পূর্ণিমা বা আশ্বিন পূর্ণিমায়। আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে ঘিরে বুদ্ধ জীবনের আরও একটি বিশেষ স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা আছে তা হল গৌতম বুদ্ধ এই পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর প্রয়াত মাতাকে তুষিত স্বর্গে গিয়ে ধর্মদেশনা করেছিলেন।

১৪. ললিত বিস্তর (১৫ পরিচ্ছেদ, পৃ: ২৫৭) এবং মহাবস্তু (২য় খন্ড, পৃ: ১৬০, ১৬৫) অনুসারে ছন্দকই বোধিসত্ত্বকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রলোভিত করেছিলেন। এখানে মারের কথা উল্লেখ নেই।

১৫. মহাবস্তুর (২য় খন্ড, পৃ: ১৬৫) মতে, কপিলাবস্তু হতে উক্ত স্থানের দূরত্ব দ্বাদশ যোজন এবং সেখানে অনোমা স্থলে অনোমিয় নামক নগরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মল্লদিগের প্রদেশে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। অনোমা নদীর বর্তমান নাম 'মঝন'। এই নদী কড়োয়া নামেও পরিচিত।

১৬. অষ্ট উসভ= ৫৬০ গজ (৭০ গজ × ৮ = ৫৬০ গজ)

১৭. এই দৃশ্য নাগার্জুন কোন্ডায় দৃষ্ট হয়।

১৮. কথিত আছে, রাজকুমার সিদ্ধার্থের আকাশে উড়ন্ত কেশ দেবরাজ ইন্দ্র ধারণ করে নিজ ভবনে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে এক মনোহর চৈত্য নির্মাণ করে তাতে কেশ স্থাপন করলেন। সেই চৈত্যের নাম 'চূড়ামনি চৈত্য'। মানুষ পুণ্য লাভের আশায় অদ্যাবধি সেই চুড়ামনি চৈত্যের উদ্দেশ্যে আকাশে প্রদীপ (ফানুস) উত্তোলন করে থাকেন।

১৯. জাতক নিদান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৯০

২০. কথিত আছে, মহাব্রহ্মা কাষায় বস্ত্র পরিধান করে তথায় ব্যাধরূপে বিচরণ করছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ব্যাধকে দেখে বললেন– "তোমার এই ব্যাধ বৃত্তির সঙ্গে গৈরিক বসন শোভিত নয়। তোমার বসন আমাকে দাও, আর আমার বহুমূল্যের বসন তুমি নিয়ে যাও।' তখন উভয়ের মধ্যে বসন বিনিময় হল। মতান্তরে কথিত আছে, মহাব্রহ্মা তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থকে অষ্ট পরিষ্কার দান করেছিলেন।

২১. মহাবস্তু (২য় খন্ড, পৃ: ১৯৫); ললিত বিস্তর, পৃ: ২৭৮; বুদ্ধচরিত, ৬/৬০; জাতকনিদান কথায় উল্লেখ আছে-বোধিসত্ত্বের মনের কথা জানিয়ে তাঁর কাশ্যপ বুদ্ধের সমকালীন অতীত জন্মের বন্ধু ঘটীকার মহাব্রহ্মা প্রব্রজিতদের ব্যবহার্য অষ্টবিধ উপকরণ (উদক-স্রাবক, সূচী, ক্ষুর, পিন্ডপাত্র, ত্রিচীবর, কটিবন্ধনী প্রভৃতি) এনে বোধিসত্ত্বের হাতে অর্পণ করলেন। পৃ: ৬৫

২২. অশ্বরাজ কণ্ঠকের বিদায়দৃশ্য গান্ধারশিল্পে দেখা যায়। ললিত বিস্তর (পৃ: ২৮১-২৮২) এবং বুদ্ধচরিত (৬/৬৬-৬৭)

২৩. বৌদ্ধ ধর্ম, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ: ৪৫

শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব, অঘোরনাথ গুপ্ত, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, পৃ: ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

২৪. পান্ডব শৈলের বর্তমান নাম- রত্নগিরি। উহা রাজগৃহের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

২৫. আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে, সেনা-নিগম ও সেনানি-গ্রাম এই দ্বিবিধ পাঠ। সেনা-নিগম অর্থে সেনা-নিবাস। সেনানি-গাম অর্থে সেনানী গ্রাম। সেনানী সুজাতার পিতার নাম। সেনানী গ্রামেই সুজাতার পিত্রালয় ছিল।

২৬. অরিয়পরিয়েসনা সুত্ত, মজ্ঝিমনিকায় সুত্ত নং ২৬

২৭. মহাসত্যক সূত্র, মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৩৬

ললিত বিস্তর, পৃ: ৩০৯-৩১১; মহাবস্তু, ২য় খন্ড, পৃ. ১২১-১২৩

ললিত বিস্তর এবং মহাবস্তুর মতে, বোধিসত্ত্ব যখন গয়াশীর্ষ পর্বতে অবস্থান করছিলেন তখনই তাঁর মনে এই ত্রিবিধ উপমা প্রতিভাত হয়েছিল।

২৮. মধ্যম নিকায়, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৬

২৯. ড. বেণীমাধব বড়ুয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

''এটা নিশ্চয়ই এক প্রকার উগ্রতপ বা হঠযোগ-প্রক্রিয়া। খেচরীবিদ্যার বর্ণনার সাথে এটার সৌসাদৃশ্য আছে। যোগ শিখোপনিষদের মতে, তালুমূল চন্দ্রের স্থান, যেখানে সুধা বর্ষিত হয়: 'তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রঃ সুধাং বর্ষত্য ধোমুখঃ'। যোগকুন্ডল্যপনিষদ্, ২ অঃদ্রঃ। উপনিষদের ভাষায় বুদ্ধবর্ণিত যোগপ্রক্রিয়ার নাম খেচরীমুদ্রা। যোগশিখোপনিষদ্, ৫ম অঃ; ৩৯-৪৩ শ্লোকঃ

"কণ্ঠং সংকোচয়েৎ কিংচিদ্ বন্ধো জালন্ধরো হ্যয়ম্।
বন্ধয়েৎ খেচরী-মুদ্রাং দৃঢ়চিত্তঃ সমাহিতঃ॥
কপাল-বিবরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।
ভ্রুবোন্তর্গতা দৃষ্টিমুদ্রা ভবতি খেচরী॥
খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধিতঃ।
ন পীষূষং পতত্যগ্নৌ ন চ বায়ুঃ প্রবাবতি॥
ন ক্ষুধা ন তৃষ্ণা ন নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে।
ন চ মৃত্যুর্ভবেত্তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম্॥''

—— মধ্যম নিকায়, ১ম খন্ড, পৃ: ২৬৬, পাদটীকা

৩০. আস্ফানক ধ্যান (পালি- অপ্পাণকং ঝানং), নিরুদ্ধশ্বাস, বস্তুত এটা কুম্ভকেরই নামান্তর। কামারের গর্গরা বা ভস্ত্রা হতে নির্গত বায়ুর ন্যায়। যোগশিখোনিষদ, ১ম অঃ শ্লোকে (৯৫-১০০) বর্ণিত হয়েছে ঃ

''মুখেন বায়ুং সংগৃহ্য ঘ্রাণরন্ধ্রেন রেচয়েৎ॥ শীতলীকরণং চেদং হন্তি পিত্তং ক্ষুধাং তৃষম্। স্তনয়োরধ ভস্ত্রেব লোহকারস্য বেগতঃ॥ রেচয়েৎ পূরয়েৎ বায়ুমাশ্রমং দেহগং ধিয়া। যথা শ্রমো ভবদ্দেহে তথা সূর্য্যেন পূরয়েৎ॥ বিশেষেণেব কর্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥''

৩১. দেবদাহ সম্বন্ধে যোগকুন্ডলী উপনিষদে উক্ত আছে- ''প্রাণস্থানং ততো বহ্নিঃ প্রাণাপ্রাণৌ চ সত্বরম্। মিলিত্বা কুন্ডলীং যাতি প্রসুপ্তা কুন্ডলাকৃতি॥ তেনাগ্নিনা চ সংতপ্তা পবনেনৈব চালিতা। প্রসার্ষ স্বশরীরং তু সুষুম্না বদনান্তরে॥''

(১ম অধ্যায়, শ্লোক ৬৪-৬৬)

৩২. পরবর্তী কালে তাঁদের নাম হয়েছিল ''পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু।'' তাঁদের মধ্যে কোন্ডণ্য ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি সিদ্ধার্থের জন্মের সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সিদ্ধার্থ অবশ্যই বুদ্ধ হবেন। অপর চারজন হলেন- ভদ্রিয়, বপ্প, মহানাম এবং অশ্বজিৎ। উক্ত গণক আটজন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন্ডণ্য ব্যতীত আর সাত জনের মৃত্যু হয়েছিলেন। তাঁদের ভদ্রিয়াদি চার পুত্র কোন্ডণ্যের অনুপ্রেরণায় ভাবী-বুদ্ধের দর্শন লাভের জন্য সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়ে কোন্ডণ্য প্রমুখ ঐ পাঁচজন সিদ্ধার্থের সন্ধান করতে করতে অবশেষে উরুবিল্বের নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধার্থকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ললিত বিস্তরের মতে, (১৭শ অধ্যায়) উক্ত পাঁচজন রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্য ছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন রুদ্রককে ত্যাগ করে চলে যান, ঐ পাঁচজন ও রাজকুমার সিদ্ধার্থকে অনুরসণ করেছিলেন। তিব্বতী মতে, সিদ্ধার্থ রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে আছেন শুনে মহারাজ শুদ্ধোদন রাজকুমার সিদ্ধার্থের পরিচর্যার জন্য তিনশত অনুচর পাঠিয়েছিলেন এবং সুপ্রবুদ্ধ দুইশত অনুচর পাঠিয়েছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ উক্ত পাঁচশত জন হতে পাঁচজনকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুনামে পরিচিত হয়েছিলেন। Rockhil, পৃঃ ২৮

৩৩. জাতকনিদান কথা, পৃঃ ৬৭

৩৪. দুর্ভিক্ষাদির সময় যখন স্ব স্ব সম্প্রদায়ের সাধকগণের ভোজনের জন্য লোক রন্ধন কার্যে ব্যাপৃত থাকে (প-সু)।

৩৫. বাং দর্দুর অর্থে ভেক্, ব্যাঙ। এস্থলে দর্দুর অর্থে শাক, আলু প্রভৃতির খোসা বুঝায়।

৩৬. পিণ্যাক অর্থে তিলকল্ক।

৩৭. উৎকুটিক এক প্রকার আসনের নাম। পায়ের গোড়ালীর উপর ভর করে সারা দিনরাত্রি উপবিষ্ট থাকা।

৩৮. দিনরাত্রি উর্ধস্থিত বা দন্ডায়মান অবস্থায় থাকা।

৩৯. জলে নামা, তীর্থস্থলে পাপধ্যেত করার জন্য ডুবা-উঠা করা (প-সু)।

৪০. জৈন আয়ারংগ সুত্তে, ওহাণ সুত্তে মহাবীরও এরূপে নিজ পূর্ব সাধনা বর্ণনা করেছিলেন।

৪১. আচার্য বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপালের মতে, হেমন্ত ঋতুর মধ্যে মাঘ মাসের চার দিন এবং ফাল্গুন মাসের চার দিন, এই আট দিন নিয়ে অন্তর-অষ্টক। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২-৪-১) মতে, হেমন্ত ও শীত ঋতুর চার কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্টতিথি নিয়ে অষ্টকা।

৪২. তপ্ত অর্থাৎ রৌদ্রতপ্ত (প-সু)

৪৩. সিক্ত অর্থাৎ হিমসিক্ত (প-সু)

৪৪. নগ্ন ও অচেলক হল একার্থবোধক শব্দ। এই সুত্তে মহামতি বুদ্ধ বুদ্ধত্ত্ব লাভের পূর্বে যে কঠোর সাধনা করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তিনি নগ্ন অচেলক বা আজীবকের ভাবেই সাধনা করেছিলেন।

৪৫. লোমহংস জাতকেও গাথাগুলো অবিকল দৃষ্ট হয়।

৪৬. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত গাথার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন-

বুদ্ধদেব, পৃ: ৪৬ (৪র্থ সংস্করণ)।

''এ আসনে দেহ মম যাক শুকাইয়া। চর্ম, অস্থি, মাংস যাক প্রলয়ে ডুবিয়া॥ না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে। টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে॥''

৪৭. দীর্ঘনিকায়, ২য় খন্ড, পৃ: ২৬১; ৩য় খন্ড, ২৬০; থেরগাথা, গাথা- ৮৩৯

৪৮. খুদ্দক নিকায় হলো সূত্রপিটকের পঞ্চম নিকায়।

৪৯. মায়ের বহু প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে। যেমন- নমূচি, মৃত্যু, অন্তক, পাপী, প্রমত্তবন্ধু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণবন্ধু।

৫০. সুত্তনিপাতের 'পধান সুত্ত' এবং 'ললিত বিস্তরে নৈরঞ্জনা পরিবর্ত' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ে এবং মহাবস্তু নামক গ্রন্থে (২য় খন্ড, পৃ: ২৩৮-২৪০, শ্লোক ১-২৭) এই বর্ণনার হুবহু সাদৃশ্য আছে। পার্থক্য রয়েছে শুধু ভাষায়। প্রথমটি পালিতে, দ্বিতীয়টি সংস্কৃতে এবং শেষেরটি মিশ্র সংস্কৃতে।

৫১. জাতক নিদান কথা, পৃ: (৭০-৭৫)। শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষুর ''জাতক নিদান-কথা'' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ: (১০০-১০৭)।

৫২. ললিত বিস্তর ২১/১৬৫

৫৩. ললিত বিস্তর ২১/১৬৬

৫৪. বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত মার বিজয়ের সাথে কুমার সম্ভব ও শিব পুরাণে বর্ণিত কন্দর্পজয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কুমারসম্ভব ও শিবপুরাণ উভয়ই ললিত বিস্তর এবং পালি গ্রন্থসমূহের পরবর্তী। বোধিসত্ত্ব মারের সাথে যুদ্ধ ও তর্ক করতে অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু শিব বৃথা তর্ক বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে একেবারেই ক্ষণকালের মধ্যে কন্দর্পকে ভস্মীভূত করেছিলেন: যথা-

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চারন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেএজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥

কুমারসম্ভব। (৩-৭২)

৫৫. ললিত বিস্তর ২১/১৯৭

৫৬. বুদ্ধচরিতে একে 'মহাপ্রীত্যহারব্যূহ'- সমাধি বলা হয়েছে। ললিত বিস্তরে একে 'প্রীত্যাহারব্যুহ' সমাধি বলা হয়েছে, ২৪শ অধ্যায়, পৃ: ৪৭৯

৫৭. ধম্মপদ, জরাবগ্গ, গাথা ৮-৯

৫৮. শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু সংকলিত ও অনূদিত উদানং (রেঙ্গুন, ১৯৩০), পৃ: ৫

৫৯. শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু সংকলিত ও অনূদিত উদানং (রেঙ্গুন, ১৯৩০), পৃ: ৫

৬০. উদান, ১ম খন্ড, বোধিসুত্ত; মজ্ঝিমনিকায় মহাতণহক্খয়সুত্ত (সুত্ত নং ৩৮)

৬১. উদান, ২য় বোধিসুত্ত; মজ্ঝিমনিকায়, মহাতণহক্খয়সুত্ত (সুত্ত নং ৩৮)

৬২ পঞ্ঞানন্দ থেরেন সম্পাদিত মহাবগ্গ (কলিকাতা, ২৪৮০ বুদ্ধবর্ষ), পৃ: ৫

৬৩. পঞ্ঞানন্দ থেরেন সম্পাদিত মহাবগ্গ (কলিকাতা, ২৪৮০ বুদ্ধবর্ষ), পৃ: ৬

৬৪. সুবোধিরতন থেরেন সম্পাদিত মহাবগ্গ (রেঙ্গুন, ২৪৭৯ বুদ্ধবর্ষ), পৃ: ১০

৬৫. গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক (জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮, ঢাকা-১০০০), পৃ: ৩৪

৬৬. রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবত পাটনা জেলার মিগার।

৬৭. মহাপরিনিব্বান সুত্তং, রাজগুরু শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির, ১ম অধ্যায়, পৃ: ১১-১৮

৬৮. এটি কোটিগ্রাম ও বৈশালীর মধ্যে অবস্থিত। (বর্তমানে মজঃফরপুর জেলার রত্তি পরগণা)। এর অন্য নাম হল- 'নাদিকা', 'এঞ্জাতিকা' অথবা 'নাদিক', 'এঞ্জাতিক'। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভগবানের জন্য ইষ্টক নির্মিত বিহার নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম ছিল 'গিঞ্জকাবসথ'। পরবর্তীকালে এই বিহার মহাবিহারে পরিণত হয়েছিল। চূলগোসিংগ সুত্তানুসারে (মজ্ঝিমনিকায়, সুত্ত নং ৩১) কোশাম্বীর ভিক্ষুরা বিবাদাপন্ন হলে ভগবান এ স্থানে এসে গোশৃঙ্গশালবনে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্য বিনয় মহাবগ্গের মতে, ভগবান প্রথমে বালকলোণকার গ্রামে গিয়েছিলেন।

৬৯. বেলুবগ্রাম বৈশালীর নিকটস্থ গ্রাম।

৭০. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদেরকে তিন মাস বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এই ব্রত আরম্ভ এবং আশ্বিনী পূর্ণিমায় এর অবসান হয়। এই তিন মাস ভিক্ষুণীগণ একস্থানে অবস্থান করে ধ্যান, সাধনা ও অধ্যাপনায় রত হন। কোন কারণে কোথাও গমন করলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুবিহীন কোন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করতে পারেন না। বর্ষাবাসের সময় ওবাদ, উপসথ ও প্রবারণা ভিক্ষুণীদের তিনটি অবশ্য করণীয়। সুতরাং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করার জন্য ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণীগণকে উপদেশ দিয়েছেন। সেখানে উপযুক্ত ভিক্ষুর অভাব নেই, প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্র সহজলভ্য এবং সেই আবাস ভিক্ষুর আবাসস্থল হতে অধিক দূরে অবস্থিত নয়, এরূপ স্থানে ভিক্ষুণীগণ বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করবেন।

৭১. এটা ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দশ মাস পূর্বের ঘটনা। সংযুক্ত নিকায় অট্‌ঠকথা, ৩য় অধ্যায়, পৃ: ১৯৮

৭২. মহাপরিনিব্বান সুত্ত, শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির, ২য় অধ্যায়, পৃ: ৫৫

৭৩. রাজগৃহেই ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭৪. রাজগৃহ থেকে বৈশালী যাওয়ার পথে উক্কাচেলা একটি গ্রাম। এটি বৃজীদেশের অন্তর্গত।

৭৫. আনন্দ তখনও অর্হৎ প্রাপ্ত হননি, তাই মার সহজেই তাকে অভিভূত করতে পেরেছে।

৭৬. মহাপরিনিব্বান সুত্ত, শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির, ৩য় অধ্যায়।

৭৭. হিউয়েন সাঙ চাপাল চৈত্যের স্থানে একটি স্তূপ দেখেছেন (২য় খন্ড, ৭ম, পৃ: ৬৯)।

৭৮. মহাপরিনিব্বান সুত্ত, শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, ৩য় অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম

(ক) চার স্মৃত্যুপস্থান- কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন

(খ) চার সম্যক প্রধান- উৎপন্ন পাপচিত্তের পরিবর্জননার্থ প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপচিত্তের অনুৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশল-চিত্তের উৎপত্তির জন্য প্রচেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল-চিত্তের বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা।

(গ) চার ঋদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিলাভের উপায়)- ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ।

(ঘ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়- শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা- ইন্দ্রিয়।

(ঙ) পঞ্চ বল- শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাবল।

(চ) সপ্ত বোধঙ্গ- স্মৃতি, ধর্মবিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশান্তি, সমাধি এবং উপেক্ষা।

(ছ) অষ্ট মার্গাঙ্গ মার্গ- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

৮০. চতুর্বিধ আস্রব- কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্ট্যাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব।

৮১. 'সূকরমদ্দব' হল এক প্রকার 'রসায়ন'। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও বল বৃদ্ধির জন্য এই জাতীয় পথ্য ব্যবহৃত হত। ভগবান বুদ্ধের বয়সের কথা চিন্তা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই চুন্দ ঐ 'রসায়ন' প্রস্তুত করেছিল। বয়সের অনুপাতে গুরুপাক হবে বলে মনে করেই ভগবান ঐ রসায়ন অন্যদের দিতে নিষেধ করেছিলেন।

৮২. চার তীর্থস্থানঃ যে স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ লুম্বিনী), যে স্থানে তথাগত সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছেন (অর্থাৎ বুদ্ধগয়া), যে স্থানে তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন (অর্থাৎ সারনাথ) এবং যে স্থানে তথাগত মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন (অর্থাৎ কুশীনগর)।

৮৩. স্তূপের যোগ্য ব্যক্তি চারজন, যথাঃ তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, তথাগতের শ্রাবক (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ) এবং রাজচক্রবর্তী।

৮৪. আনন্দের চতুর্বিধ অত্যাশ্চর্য গুণ- রাজচক্রবর্তীয় ন্যায় আনন্দেরও চতুর্বিধ গুণ ছিল। যেমনঃ

(ক) ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুণী পরিষদ, উপাসক পরিষদ এবং উপাসিকা পরিষদ আনন্দকে দর্শন মাত্রেই প্রীত হন।

(খ) আনন্দ ধর্মালাপ করলে তাঁর বাক্যসুধা পান করেও সকলে আনন্দিত হন।

(গ) আনন্দকে দর্শনে ও তাঁর বাক্যসুধা পানে তাদের তৃপ্তি হয়না।

(ঘ) তাদের অতৃপ্ত অবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করেন।

৮৫. পালি দীর্ঘনিকায়, সুত্ত নং ১৭

৮৬. "হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো,
বয়ধম্মা সংখারা অপ্পমাদেন সম্পদেথা'তি।"

৮৭. সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণস্থান কুশীনগরে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। হিউয়েন সাঙ (২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ, পৃ: ৩৩)

৮৮. সৌন্দরানন্দ কাব্য, ১৬শ অধ্যায়, শ্লোক ২৮-২৯

৮৯. ভগবান বুদ্ধের দেহ সৎকারের দৃশ্য গান্ধার শিল্পে দেখা যায়।

৯০. ভগবান বুদ্ধের আটটি শরীরস্তূপ নির্মিত হয়েছে আটটি রাজ্যে। যথা: রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদ্বীপ, পাবা এবং কুশীনগর।

৯১. যে কুম্ভে ভগবান বুদ্ধের অস্থিসমূহ রক্ষিত ছিল তা দ্রোণ ব্রাহ্মণ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার উপর স্তূপ নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন। দিব্যাবদানে (পৃ: ৩৮০) 'দ্রোণস্তূপের' উল্লেখ আছে, যা মগধরাজ অজাত শত্রু নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত এই দ্রোণস্তূপের নাম হতেই ব্রাহ্মণ দ্রোণের নাম উক্ত হয়েছিল।

৯২. পিপ্ফলিবনের মৌর্যরা পিপ্ফলিবনে অঙ্গারস্তূপ নির্মাণ করেছিলেন।

ZZxq Aa¨vq

mZ¨vbmÜvb

AvhmZ¨

fwgKv

আর্যসত্য বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। জীবন ক্ষণভঙ্গুর। তাই জগৎ দুঃখময়। অতৃপ্তি, শোক, বিলাপ প্রভৃতি নিয়ে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৃষ্ণা হেতু আবার জন্মগ্রহণ করে। বার বার জন্মগ্রহণ দুঃখকর। অষ্টাঙ্গিক মার্গ নির্বাণ লাভের একমাত্র পথ। চারভাগে বিভক্ত বুদ্ধের এ ধর্মতত্ত্ব চার আর্যসত্য অর্থাৎ চতুরার্য সত্য নামে অভিহিত।

সুখ-দুঃখ নিয়ে মানুষের জীবন। কিন্তু জগতে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাই অধিক। সুখের অনুভূতি বিদ্যুতঝলকের মত ক্ষণস্থায়ী। চোখের পলকে তলিয়ে যায়। পরিণামে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা বর্ণনাতীত। প্রতিনিয়ত দুঃখের দহনজ্বালায় দগ্ধ হতে হয়। মাতৃজঠরে জন্ম থেকে আমৃত্যু দুঃখ ভোগ করতে হয়। চতুরার্য সত্যে যথার্থ জ্ঞান ছাড়া মানবের বিমুক্তি নেই।

তথাগত বুদ্ধ লক্ষাধিক চার অসংখ্য কল্প জন্ম পরিগ্রহণ করে সকল পারমী পূর্ণ করে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ও ত্যাগ তিতিক্ষার দ্বারা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করেন এবং যে সত্য উপলব্ধি করেন তাকে সংক্ষেপে চতুরার্য সত্য বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন ''চতুসচ্চো বিনিমুত্তো ধম্ম নাম নত্থি।'' অর্থাৎ চতুরার্য সত্য ধর্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম নেই।[১]

সুতরাং দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চতুরার্য সত্যের প্রথম তিনটিকে পর্যবেক্ষণ করে চতুর্থ আর্যসত্য বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করতে হয়। এতে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা যায়। তাই বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে চতুরার্য সত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Avhm‡Z¨i msÁv

আর্যসত্য মানে শ্রেষ্ঠ সত্য। আর্যগণের জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট যে সত্য তার অপর নাম আর্যসত্য। যিনি ক্ষমাশীল, শত্রুহীন ও নির্ভীক তিনিই আর্য। যে ব্যক্তি প্রাণীহিংসা করে তা দ্বারা সে আর্য হতে পারে না; যিনি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাভাবাপন্ন তিনিই আর্য বলে কথিত হন।[২] কিন্তু এখানে আর্য বলতে বুদ্ধ ও পচ্চেক

বুদ্ধগণকে বুঝানো হচ্ছে। কারণ, তাঁরা জ্ঞানযোগে আর্যসত্যকে দর্শন করে জন্ম-মৃত্যুর অতীত হয়েছেন। অর্থাৎ নির্বাণ অধিগত হয়েছেন। বিশেষ অর্থে বুদ্ধ যে শ্রেষ্ঠ সত্য দেশনা করেছেন তাকে আর্যসত্য বলা হয়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষার দ্বারা বুদ্ধ যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাকে সংক্ষেপে চতুরার্য সত্য বলা হয়।

সুখ ও দুঃখ মানুষের জীবনে আলোছায়ার মত দৃশ্যমান। ধুলার ধরণীতে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাই অধিক। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

''দুক্খমেব হি সম্ভাতি দুক্খং বেতি তিট্ঠতি,
নাঞ্ঞেঞ দুক্খা সম্ভোতি নাঞ্ঞেঞ দুক্খা নিরুজ্ঝন্তি।''

জগতে কেবল দুঃখ-সত্যেরই উৎপত্তি ও বিলয় হয়। দুঃখ ব্যতীত অপর কিছু উৎপন্ন হয় না, নিরোধও হয় না।

জগৎ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। তা বিশ্বের স্বীকৃত সত্য। বুদ্ধ একে এক বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারো কারো মতে সংসারে সুখও আছে। কিন্তু সে সুখ ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিণাম দুঃখজনক। অদূরদর্শীর নিকট দুঃখও কোন কোন সময় সুখরূপে প্রতিভাত হয়। সুখ থাকলেও ক্ষণস্থায়ী যার ফল দুঃখের দিকে ঠেলে দেয়।

মানব জীবন যেন এক দুঃখের সমুদ্র। সেই জীবনের বেলাভূমিতে নিরন্তর আছড়ে পড়ে, দুঃখানুভূতির মর্মদাহে জীবন প্রতিনিয়তই দগ্ধ হচ্ছে। ক্ষণভঙ্গুর সংসারে নিত্য বলতে কিছু নেই। মানুষ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে সংসারকে নিত্য ভাবে। দুঃখকে সুখ মনে করে মরীচিকার পেছনে ছুটে যায়। এটা ভ্রান্তি বিশেষ। তাই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জন্মচক্রে আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে যাঁরা প্রজ্ঞাবান তাঁরা দুঃখকে দুঃখ মনে করে সত্যের সন্ধান করে। আর্যসত্যকে যথাযথভাবে দর্শনই প্রকৃত জ্ঞান। চতুরার্য সত্য নিম্নরূপ:

১. দুঃখ আর্যসত্য
২. দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য
৩. দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
৪. দুঃখ নিরোধগামিনী আর্যসত্য

1. ‘tL AvhmZ¨

সংসার চক্রের আবর্তনে প্রাণীগণের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয়। জন্ম-মৃত্যুতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। এটাই দুঃখ আর্যসত্য।

দুঃখ বহু প্রকার: যেমন- জন্ম দুঃখ, জরা বা বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক, পরিতাপ, দুর্মনতা ও উপায়াস দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ ও প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইস্পিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ।

সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দুঃখ।[৩]

K. Rb¨- জন্মগ্রহণ বলতে প্রাণীগণের নিজ নিজ মাতৃগর্ভে ধারণ, উৎপত্তি, আবির্ভাব বুঝায়। একটি প্রাণীর মাতৃগর্ভে ধারণ, উৎপত্তি ও জন্ম অত্যন্ত কষ্টকর। তাই জন্মগ্রহণ দুঃখময়। পঞ্চস্কন্ধের দেহ ও মন আবির্ভাবও বলা যায়।

L. Riv ev evaK¨- প্রাণিদের নিজ নিজ দেহের জড়তা (বার্ধক্য), জীর্ণতা, দন্তাদির পতন, চর্ম শিথিলতা, কেশরাশির পক্কতা, ইন্দ্রিয়সমূহের অক্ষমতা, আয়ুক্ষয় (বার্ধক্য) বুঝায়। বার্ধক্য জীবকে অচল করে দেয়। স্বাভাবিক গতিশীলতা থাকে না। এটাও দুঃখের অন্তর্গত।

M. e¨wa- জীবের দেহ বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে (রোগে) আক্রান্ত হয়। ক্ষুধা ও যন্ত্রণা প্রাণীদের নিত্য সহচর। এ ব্যাধি প্রাণীকে মরণতুল্য দুঃখ প্রদান করে।

N. gZ¨- মৃত্যু বলতে প্রাণিগণের দেহের অবসান, চ্যুতি, অন্তর্ধান, কালক্রিয়া বুঝায়। নিস্তেজ পরিণতিই এর লক্ষণ। মৃত্যুতে শোক, বিলাপ, অন্তর্দাহ, মানসিক দুশ্চিন্তা, আঘাত সৃষ্টি করে যা অত্যন্ত দুঃখকর। মৃত্যু বলতে স্কন্ধসমূহের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) পরিণতি এবং কালের (দেহের) নিক্ষেপও বুঝায়।

O. †kvK (wcq we‡qvM)- স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ধান (বিনাশ) বা মৃত্যুর কারণে প্রিয়বিয়োগ হয়। ‘শোক’ শব্দের অর্থ আন্তরিক কষ্ট, শোকভাব, অন্তশোক বুঝায়। প্রিয়বস্তু হারানো যে কত দুঃখজনক তা বর্ণনাতীত।

P. cwi‡'e- বিলাপ, পরিতাপ, অন্তর্তাপ, অন্তর্দাহ অর্থে প্রযোজ্য।

Q. 'gbZv- মনের দুঃখ, মনের বেদনা। চৈতসিক দুঃখ, চৈতসিক অনাস্বাদ, চিত্ত সংস্পর্শজ দুঃখ, অনাস্বাদ ইত্যাদি বুঝায়।

R. Dcvqvm- মনের পরিদাহ, মনের আগুন, আশাহীনতা প্রভৃতি অর্থে গৃহীত।

S. Awcq ms‡hvM- নিজের অরুচিজনক ব্যক্তির সাহচর্য, তাদের সাথে বসবাস, তাদের অধীনে কাজ কর্ম করা ইত্যাদি।

T. wcq we‡qvM- স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিচ্ছেদ, তাদের মৃত্যু ইত্যাদি।

U. Bw¯úZ e¯i Acwß- মানুষের আশার শেষ নেই। এক আশার তৃপ্তি হতেই অন্য চাহিদার প্রভাব। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন আশা নদীর মত প্রবাহমান। অতৃপ্ত বাসনাই মানুষের জন্য দুঃখের মূল। অতৃপ্ত আশা সকলকে দুঃখ দিয়ে থাকে।

V. cÂ Dcv'vb¯ÍÜ- উপাদান মানে উপকরণ, নির্মাণ সামগ্রী এবং স্কন্ধ হল কাঁধ, অংশ, বিষয়। যে সমস্ত উপাদানে প্রাণিগণের সৃষ্টি হয় তার নাম পঞ্চস্কন্ধ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান- এ পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সত্ত্ব বা প্রাণী নামক পদার্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ 'আমি' বা 'সে' নামক সত্ত্বটির অস্তিত্ব ঘটে। পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয়ভূত হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসে তখনই তাকে উপাদান স্কন্ধ বলে। পঞ্চস্কন্ধ জড়-চেতনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জীবন-প্রবাহ। একে 'সত্ত্ব' বা 'জীব' নামেও অভিহিত করা হয়। পরমার্থ হিসেবে এর স্বতন্ত্র কোন সত্ত্বা নেই। লৌকিক অস্তিত্ব মাত্রই দুঃখকর। বুদ্ধ 'পঞ্চস্কন্ধ'কে নামরূপ আখ্যা দিয়েছেন। নাম হচ্ছে মন এবং রূপ হচ্ছে দেহ। দেহ ভৌতিক, মন অভৌতিক চেতনা। জীব, জীবন, মানুষ, প্রাণী, আমি, তুমি, সে- নামরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে দেহ থেকে মন বিচ্ছিন্ন হলে অস্থি-কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। লৌকিক অস্তিত্ব মাত্রই দুঃখকর।

উপরোক্ত দুঃখসমূহ মানুষ জন্মের সাথে সাথে নিয়ে আসে। উৎপন্ন জীবের মধ্যে ভাবী দুঃখের বীজ সুপ্ত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। উপরে উৎক্ষিপ্ত ঢিল যেমন মধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না, অতি শীঘ্র মাটিতে পতিত হয়, সেরূপ জন্মগ্রহণ করলেই মানুষকে সেই দুঃখসমূহ ভোগ করতে হয়। এতে

ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করার পর উদান (গাথা) বলেছিলেন-

''দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।''

অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করাই দুঃখ।

পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান।

K. i‡c- রূপ হচ্ছে চার মহাভূত; পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি। এ চারটি উপাদানে জীবন সচল থাকে।

L. †e‘bv- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা তাদের চিন্তায় সুখ, দুঃখ কিংবা সুখও নয়, দুঃখও নয়- এরূপ অনুভূতিকে বেদনা বলে।

M. msÁv- বেদনার কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতির পর অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় আমাদের মনে যে প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞান জন্মে তাই সংজ্ঞা।

N. ms¯‹vi- রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে ও যা আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের সহায়ক হয়। যার দ্বারা জানতে পারি ‘ইনি দেবদত্ত, ব্রহ্মদত্ত-এ প্রক্রিয়ার ‘সমবায়’ই সংস্কার।

O. ‡eÁvb- চেতনা বা মনকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিঞ্ঞাণ বা বিজ্ঞান- রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা সহযোগে উৎপন্ন চেতনা বা চিত্তের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সত্য-মিথ্যা উদঘাটনই বিজ্ঞানের ধর্ম। বিজ্ঞানের সাথে জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক আছে।

বুদ্ধ শোক, ক্রন্দন, হাহুতাশ প্রভৃতি দুঃখরূপ সমস্যার কাতর না হয়ে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে দৃঢ় মনোবল ও সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধানের কথা বলেছেন-

উত্তিট্ঠে ন পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোক পরম্হি চ।[৪]

অর্থাৎ উঠ, জাগ্রত হও; প্রমত্ত হবে না। সুচরিত ধর্মের অনুগামী হও। ধর্মচারী ইহলোক ও পরলোকে সুখী হয়।

2. ‘tL mg‘q AvhmZ¨

দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য বলতে দুঃখের কারণ বা হেতুকে বুঝায়। দুঃখের হেতু বা কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা। কামনাকে আশ্রয় করে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা অনুরাগ সহগত হয়ে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে আকৃষ্ট হয়। অগ্নির উপাদান যেমন কাষ্ঠ, তেমনি জন্ম ও তজ্জনিত দুঃখের উপাদান হল তৃষ্ণা। এটা পুনর্জন্মকে আহ্বান করে।

তৃষ্ণা তিন প্রকার: যথা- কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা।

K. KvgZòv- ইন্দ্রিয়ের প্রিয় বস্তুই কাম। ঐ বিষয়ের প্রতি সম্পর্ক এবং এর প্রতি মনোযোগই তৃষ্ণার জনক বা ভব। বিষয় বাসনার প্রতি প্রলোভনই এর লক্ষণ। একে ভোগতৃষ্ণাও বলা হয়।

‘‘কামের (প্রিয় বস্তু ভোগের) নিমিত্তই এক রাজা অপর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে, গৃহপতি (বৈশ্য) গৃহপতির রিরুদ্ধে, পুত্র মাতার বিরুদ্ধে, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, ভগ্নি ভাইয়ের বিরুদ্ধে, ভগ্নি ভগ্নির বিরুদ্ধে, মিত্র মিত্রের বিরুদ্ধে বিবাদ করে। তারা পরস্পর কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ করতে গিয়ে একে অপরকে হস্ত দ্বারা, দণ্ড দ্বারা, অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করে। এতে তাদের মৃত্যু হয় অথবা মৃত্যুসম দুঃখ হয়।’’[৫]

L. fe Zòv- মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে বিভ্রান্ত মন সারহীন, অনিত্য, অশাশ্বত জগতকে সার, নিত্য ও ধ্রুব বলে মনে করে। এরূপ মিথ্যা ধারণায় যে তৃষ্ণা ভবের অনুরাগে রূপান্তরিত হয় তার নাম ভব তৃষ্ণা।

M. wefe Zòv- এ ভৌতিক দেহ ভস্মীভূত হলে আর কিছুই থাকে না। নতুন জন্মও হয় না। মৃত্যুর পর সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এরূপ মিথ্যা ধারণাযুক্ত জীবনকে ভোগ করার যে ইচ্ছা তার নাম বিভব তৃষ্ণা। উচ্ছেদ দৃষ্টি সমন্বয়ে উৎপন্ন বাসনাই বিভব তৃষ্ণা।

অবিদ্যার কারণে তৃষ্ণাহেতু মানুষ দুঃখ ভোগ করে। মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম নেয়। সমদুঃখ জ্বালার জনকই তৃষ্ণা। এটা দুর্গতির দিকে প্রাণিকে টেনে নিয়ে যায়। সর্বত্র মায়াজাল বিস্তার করে। সে মায়াজালে জীবগণ আবদ্ধ। তার প্রভাব দূরতিক্রম্য। অজ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট তার স্বভাব আচ্ছন্ন থাকে। তারা তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারে না। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা তৃষ্ণাকে যথার্থভাবে জানেন। তাঁরা তৃষ্ণাকে সর্ব দুঃখের মূল

হিসেবেই গ্রহণ করেন। ভাবী দুঃখের কারণ তৃষ্ণাকে ধ্বংস করে প্রকৃত সুখ অনুভব করেন। তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না।

3. ‘tL wb‡iva AvhmZ¨

তৃষ্ণার নিরোধ হলে উপাদানের নিরোধ হয়। উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়। ভবের নিরোধে জরা, মরণ, শোক, রোদন, মানসিক দুশ্চিন্তা এবং সর্বপ্রকার অশান্তির উপশম হয়। এভাবে সমস্ত দুঃখরাশির নিরোধ হয়ে থাকে। এ দুঃখ নিরোধ বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু।

বৃক্ষের মূল দৃঢ় থাকলে যেমন আবার অঙ্কুরিত হয়, তেমনি তৃষ্ণার মূলচ্ছেদ না হলে আবার দুঃখ প্রদান করে। তৃষ্ণার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকলে অনুকূল উপাদানে তা বিপুল আকার ধারণ করে। জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ বৃদ্ধি পায়। তৃষ্ণাই জন্মান্তর রচনা করে। তাই সাধক চতুর্থ আর্যসত্য বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে তৃষ্ণাকে ধ্বংস করেন। তিনি বিদ্যার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণ লাভ করেন।

তৃষ্ণার অবশেষ, বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি, আশ্রয়-বিহীনতা নিবৃত্তিই দুঃখনিরোধ আর্যসত্য। হেতু বশতঃ মানুষ জন্মগ্রহণ করে। হেতু নিরুদ্ধ হলেই জন্ম নিরুদ্ধ হয়। চক্ষু প্রসাদ, রূপালম্বন, চক্ষু-বিজ্ঞান এই তিনটির সংস্পর্শ হলে মানুষ সুখ-দুঃখ অনুভব করে। সংস্পর্শ হতে বেদনা বোধ হয়। বেদনা হতে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। এই উপায়েই বেদনার কারণে তৃষ্ণার, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, ভব, অবিদ্যা, সংস্কার প্রভৃতির উদ্ভব হয়। এই উপায়েই বেদনার কারণে তৃষ্ণার, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, ভব, অবিদ্যা, সংস্কার হেতুরূপে উৎপন্ন হয়ে দুঃখ প্রদান করে। এভাবে দুঃখের নদী সংসারে চির প্রবাহমান। এই তৃষ্ণার অশেষ নিরোধ করতে পারলেই দুঃখ নিরোধ করা সম্ভব হয়। এই অবিসংবাদিত চিরন্তন সত্য যারা উপলব্ধি করতে অক্ষম, তাদের পক্ষে দুঃখ নিবৃত্তির স্বপ্ন সুদূর পরাহত। এজন্য দুঃখ সত্য জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ সত্যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হলেই মানুষ ‘নিরোধ’ বা ‘নির্বাণ’ লাভ করতে সক্ষম হন। এ দুঃখ নিরোধ বা নির্বাণের অপর নাম নিরোধ সত্য।

সুতরাং যে কারণ সামগ্রী হতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, আবার ওদের বিনাশ হলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সেজন্য বলা হয়েছে:

যেমন দৃঢ়-মূল শিকড় উৎপাটিত না হলে ছিন্ন বৃক্ষ পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে, তদ্রুপ চিত্ত-সন্ততিতে অনুশায়িত তৃষ্ণার সমুচ্ছেদ না হলে এ দুঃখময় জীবন পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়।[৬]

4. ‘tL wb‡ivaMwgbx cwZc‘v AvhmZ¨ ev ‘tL wb‡iv‡ai Dcvq

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকেই দুঃখ নিরোধের উপায় বলা হয়। এর অপর নাম মজ্ঝিম পটিপদা বা মধ্যমপন্থা। কৃচ্ছ্রসাধন ও ভোগস্পৃহা- এ দুটির অন্তসাধন হয় বলে একে মধ্যপন্থা নামে অভিহিত করা হয়। এতে একদিকে শরীর নিগ্রহপূর্বক বৈদান্তিক ঋষিদের কৃচ্ছ্রসাধ্য কঠোর তপশ্চয়ণ যেমন নেই, অন্যদিকে ইতরজন পরিভোগ্য, অনার্য, অনর্থযুক্ত অতিরিক্ত কাম্যবস্তু উপভোগও নেই। এ উভয় অন্ত পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধ মানবজাতির নিকট দুঃখের বিনাস এবং শান্তির প্রকাশক বিমুক্তি বা নির্বাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি অঙ্গ হচ্ছে: সম্যক (সৎ) দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি।

K. mg¨K ‘wó- এটা সত্য বা অভ্রান্ত দৃষ্টি। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ও ভাল-মন্দ কর্মের যথার্থ জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলে। বিশেষ করে ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপ- অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম; চার আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও প্রতীত্য সমুৎপাদেও যথার্থ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই সম্যক দৃষ্টি। চতুরার্য সত্যের কোন একটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে চলবে না, প্রত্যেকটিতে সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হবে। সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার: লৌকিক সম্যকদৃষ্টি ও লোকুত্তর সম্যকদৃষ্টি। মানুষ স্বীয় কর্মের ধারক ও বাহক- এরূপ যথার্থ জ্ঞানই লৌকিক সম্যকদৃষ্টি। মার্গ ও ফল সম্পর্কে জ্ঞানই লোকুত্তর সম্যকদৃষ্টি।

L. mg¨K msKí- এটা হচ্ছে উত্তম সংকল্প। সত্যজ্ঞান অনুসারে জীবন গঠনের জন্য সাধকের সৎ সংকল্পবদ্ধ হতে হয়। তিনি ভোগ লালসা ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে জীবনযাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন। হিংসা, বিদ্বেষ পরিহার করে সবারই প্রতি মৈত্রী, করুণা সম্প্রসারিত করেন। এরূপ চিন্তাই সম্যক সংকল্প। এতে কাম ও ক্রোধ পর্যায়ক্রমে সমুচ্ছিন্ন হয়।

ইহা দ্বিবিধ: লৌকিক সম্যক সংকল্প ও লোকুত্তর সম্যক সংকল্প। তৃষ্ণা বর্জনের চিন্তা, পরহিত কামনা, মৈত্রী চিত্ততা, হত্যা ত্যাগ করার ইচ্ছা, করুণ চিত্ত হবার চিন্তাই লৌকিক সংকল্প। আট প্রকার লোকুত্তর চিত্তে উৎপন্ন সংকল্পই লোকুত্তর সম্যক সংকল্প।

M. mg¨K evK¨- মিথ্যা ও লাগানো কথা, কটু ও বৃথা বাক্য কথন থেকে বিরত হয়ে সত্য, প্রিয়, শ্রুতিমধুর ও অর্থপূর্ণ বাক্যই সম্যক বাক্য। দশ সুচরিত শীলে বর্ণিত চার প্রকার বাক্য, বিরহিত বাক্য অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বিহীন বাক্যই সুভাষিত বাক্য।

N. mg¨K Kg- সম্যক কর্ম হচ্ছে প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যাভিচার বিরহিত যে কর্ম তা সম্যক কর্ম। সকল প্রকার অসৎকর্ম পরিত্যাগ করে সৎকর্ম সম্পাদনের নামই সম্যক কর্ম। বাক্য সংযমের ন্যায় দৈহিক কর্ম সংযম করতে হয়।

O. mg¨K RxweKv- অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ বাণিজ্য- এ পঞ্চবিধ মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে কৃষি, সৎ ব্যবসা, শিক্ষকতা, চাকুরী ইত্যাদি সৎ জীবিকা দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে হয়।[৭] সৎ জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করাই সম্যক জীবিকা। এগুলো থেকে বিরত থাকা নীতিগুলো বুদ্ধের দেশিত পঞ্চশীলের অন্তর্গত।

P. mg¨K e¨vqvg (c‡Póv)- উৎপন্ন পাপের বিনাশ, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন, উৎপন্ন কুশল (পুণ্য) সংরক্ষণ এবং অনুৎপন্ন কুশল (পুণ্যের) উৎপাদনই সম্যক প্রচেষ্টা। চিত্তশুদ্ধির প্রবল অধ্যাবসায়ই হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম বা সৎপ্রচেষ্টা। অধ্যাবসায়ের গুণেই নিজের প্রচেষ্টা বা উদ্যমের ক্ষেত্রে বীর্যকে আরো গতিশীল করতে হয়। বীর্য হচ্ছে মানুষের জন্য স্তম্ভ সদৃশ।[৮]

Q. mg¨K ¯§wZ- স্মরণ ও উপগ্রহণ হচ্ছে স্মৃতির লক্ষণ, যথাযথ পর্যবেক্ষণ। দেহ, বেদনা, চিত্ত ও ধর্মসমূহের যথার্থ দর্শনই সম্যক স্মৃতি। এদের অপবিত্রতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা সম্পর্কে গমনে, উপবেশনে, শয়নে, দাঁড়িয়ে স্মৃতি করলে মন সমাধিতে পর্যবসিত হয়। বলতে গেলে, কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শনই সম্যক স্মৃতি। সম্যক স্মৃতির দ্বারা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান বৃদ্ধি হলে নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। স্মরণ ও উপগ্রহণ হচ্ছে স্মৃতির লক্ষণ।[৯]

R. mg¨K mgvwa- চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধি বলা হয়। সমাধি দ্বারা মনের অস্থিরতা দূরীভূত হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যানের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক সমাধি।

দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ভেদে বিভক্ত করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:

K. cÁv : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প

L. kxj : সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা

M. mgwa : সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা- এই ত্রিবিধ কল্যাণই বুদ্ধ শাসনের মূল।[১০]

অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখমুক্তির একমাত্র উপায়। এ মার্গ অনুসরণ করলে মানুষ সকল প্রকার দুঃখের অন্তসাধন করে পরম সুখকর নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

Avh Aóvw½K gvM

বুদ্ধের অভিন্ন মতবাদ হচ্ছে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (আরিযো অট্ঠাঙ্গিকো মগ্গো)। এটাই দুঃখ মুক্তির একমাত্র উপায়। বুদ্ধ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে ছয় বছর কঠোর তপস্যার পর সম্যক জ্ঞান লাভ করে অভিসম্বুদ্ধ হন। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেব-মানবের হিতের জন্য অষ্টাঙ্গ সমন্বিত ধর্ম প্রচার করেন। মানুষ সাংসারিক দুঃখ, ভীতি ও উপদ্রব হতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য পর্বত, বন, আরাম, চৈত্য, বৃক্ষ প্রভৃতির শরণ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই সব শরণ উত্তম শরণ নয়। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ; চার আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গই মানুষের শ্রেষ্ঠ শরণ। কারণ, এই মার্গ অনুসরণ করলে মানুষ সর্ব দুঃখের অন্তসাধন করে পরম সুখকর নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। অষ্টাঙ্গ সমন্বিত বলে একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়।[১১] 'মগ্গ' বা মার্গ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ, সড়ক, রাজপথ, উপায়। এখানে সদ্ভাবে জীবন যাপনের উপায় হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ হচ্ছে নৈতিক জীবন গঠনের উপায়। সাধুতার পথ, পবিত্রতার পথ, নির্বাণ লাভের উপায়, বিমুক্তির পথ। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ আয়ত্ত ও অনুশীলন করতে পারলে সংসার জীবন যেমন সুখকর হয়, তেমন সাধকের ইহজীবনের দুঃখের নিবৃত্তি হয়। নির্বাণের অনুভূতি আসে, প্রত্যক্ষ জীবনে মার্গফল লাভ করা যায়। অঙ্গগুলো হচ্ছে- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। আবার অনুশীলনের সুবিধার্থে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ভেদে নিম্নরূপভাবে বিভক্ত করা যায়:

K. cÁv : সম্যক (সৎ) দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প

L. kxj : সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা

M. mgwa : সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি

একমাত্র দুঃখমুক্তির উপায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে মানুষ সকল প্রকার দুঃখের অন্তসাধন করতে পারেন এবং পরম সুখকর নির্বাণ লাভে সক্ষম হন। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যম প্রতিপদা দ্বি-অন্ত বর্জিত: ১. কৃচ্ছসাধন ও ২. ভোগস্পৃহা। অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধন কিংবা ভোগস্পৃহার সহজ তৃপ্তি সাধন কোনটাই

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার উপযোগী নয়। সেজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ উপরোক্ত দুই প্রকার অন্তবর্জন করে বুদ্ধ-নির্দেশিত অষ্টাঙ্গ মার্গ সাধনায় তৎপর হয়ে অর্হত্বফল লাভের জন্য সচেষ্ট হন।

1. mg¨K ‘wó- mZ¨ ev Aåvš Í ‘wó, h_v_ Ávb

অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ জীব ও জগৎ সম্পর্কে মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তধারণা পোষণ করে তাতে আবদ্ধ থাকে। বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের ফলে সূর্যোদয়ের অন্ধকার দূরীকরণের ন্যায়, সেই মিথ্যাদৃষ্টি নিরসন হয়। দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রথমে সম্যক দৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। যাঁরা ইহ-পরলোক সম্বন্ধে স্বয়ং অভিজ্ঞ হয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে প্রকাশ করে থাকেন, যাঁরা এ দশবিধ বিষয়ে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস করেন তাঁরাই দৃষ্টিসম্পন্ন।[১২] আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি (কার্য-কারণ নীতি), কর্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি। এটি মোহ বা অবিদ্যাকে সমুচ্ছেদ করে।

সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার: লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ও লোকুত্তর সম্যক দৃষ্টি।

যে সমস্ত লোক এখনও মার্গফল লাভ করেন নি, এদের কর্ম ও কর্মফল বিশ্বাসই লৌকিক সম্যক দৃষ্টি। আর যাঁরা মার্গফল লাভ করে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী ও অনাগামী-এ তিন স্তরের ফলজ্ঞান লাভ করেন তাঁরা লোকুত্তর সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। বস্তুত যাঁরা সৎকর্ম ও এর মূল জ্ঞাত হয়ে নির্বাণ উপলব্ধি করেন, তাঁরাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। আর যাঁরা এ প্রক্রিয়ায় রত আছেন, তাঁদের লৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়। সম্যক দৃষ্টিকে সেখ (শিক্ষার্থী) ও অসেখ (জ্ঞানী) হিসেবেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সমস্ত লোক এখনও মার্গফল লাভ করেন নি, তারাই পৃথকজন। বলতে গেলে দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধ মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞানই সম্যক দৃষ্টি।[১৩] যে সমস্ত লোক কুশল, অকুশল এবং কুশলাকুশলের মূল জ্ঞাত হয়ে অবিদ্যার অশেষ নিরোধ করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন, তারাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এরূপ ব্যক্তির দৃষ্টি ঋতুগত হয়। তিনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং ত্রিরত্নের প্রতি অচলা ভক্তিসম্পন্ন হন। তিনি অস্মিতাভাব বা ‘অহংভাব’ সমূলে উৎপাটন করে অর্হৎ, অমর নির্বাণ লাভের সাধনায় তৎপর হন।

2. mg¨K msKí- সম্যক সংকল্প বলতে সৎ সংকল্প বা উত্তম সংকল্প বুঝায়। সম্পদ অর্জন এবং পরম মুক্তির জন্য প্রয়োজন সৎ সংকল্পের। এরূপ হয় বীর্যবান ও উদ্যোগী। এরূপ ব্যক্তির চিত্তে কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না। হৃদয় থাকে মৈত্রী করুণায় পরিপূর্ণ। কুশলকর্মে তিনি থাকেন সতত নিয়োজিত।

যেমন- বিদ্যার্জন করা, ধ্যানে রত থাকা, সমাধি করা ইত্যাদি হলো সৎ সংকল্প। এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা, চাকুরি করা ইত্যাদিতেও সম্যক সংকল্প থাকলে কৃতকার্য হওয়া যায়।

সম্যক সংকল্প তিন প্রকার: যথা- ১. নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, ২. অব্যাপদ সংকল্প এবং ৩. অবিহিংসা সংকল্প। ভোগবাসনা ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের যে সংকল্প তাকে নৈষ্ক্রম্য সংকল্প বলে। চিত্তের অকুশলভাব ত্যাগ করে কুশল চিন্তায় মনোনিবেশ করার নামই অব্যাপদ সংকল্প।[১৪]

3. mg¨K e¨vK¨- এটা হচ্ছে সৎ বা সুভাষিত বাক্য। চতুর্বিধ অকুশল বাক্য বর্জন বা কর্ণ সুখকর, সদর্থপূর্ণ সুভাষণ বুঝায়। চতুর্বিধ অকুশল বাক্য হচ্ছে: ক. মৃষাবাদ, খ. পরুষ বাক্য, গ. পিসুন বাক্য এবং ঘ. সম্প্রলাপ। উপরোক্ত চার প্রকার বাক্য ব্যতীত যে বাক্য শ্রুতি মধুকর, যা ধর্ম সম্মত, কালোপযোগী এবং নির্দোষ তাই সম্যক বাক্য। যে ব্যক্তি মিথ্যা, অপ্রিয় ও কর্কশ বাক্য কথন থেকে বিরত হয়ে সত্যবাদী, মিলনবাদী, মধুরভাষী ও সারগর্ভভাষী হবেন এবং বাচনিক সংযমের সীমা লঙ্ঘন করবেন না, তিনিই সুভাষিত ব্যক্তি। তাঁর বাক্য কর্ণ-সুখকর, শ্রুতিমধুর ও সদর্থপূর্ণ হতে হবে। বাচনিক সংযমী ব্যক্তি চার প্রকার[১৫] গুণে গুণান্বিত হন। যথা-

i. মুসাবাদা বা মিথ্যাকথা থেকে বিরত হয়ে আত্মহেতু, পরহেতু সজ্ঞানে মিথ্যাকথা বলেন না। সত্যবাদী হয়ে অন্যেরও বিশ্বাসভাজন হন না। সত্যবাদীতার একটি সার্বজনীন মূল্য রয়েছে। সত্যবাদীকে সবাই ভালবাসেন। সকলেই শ্রদ্ধা করেন। যিনি সত্যবাদী তিনি সকলেরই প্রিয় হন। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা মধুর ও অর্থপূর্ণ হওয়া উচিৎ। এতে জীবনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বাচনিক সংযমের অভ্যাসও গড়ে উঠে। এছাড়া জীবন পরিক্রমা সুন্দর ও সার্থক হয়। সম্যক বাক্যের মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে শান্তি, সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্যক বাক্যকে আমরা সফলভাবে ব্যবহার করতে পারি।

ii. পিশুন বা ভেদবাক্য থেকে বিরত ব্যক্তি হিংসাবশত ও ভেদ সৃষ্টির অকারণে অন্যদের মিত্র বা বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন।

iii. পরুষ বা কর্কশবাক্য থেকে বিরত ব্যক্তির কথা শ্রুতিমধুর, নিদানপ্রিয়, কল্যাণজনক, জনপ্রিয় বলে তাঁকে সবাই সম্মান করেন।

iv. যিনি প্রলাপ বা বৃথা বাক্য থেকে বিরত থাকেন তিনি সজ্জন বলে আখ্যায়িত হন।

4. mg¨K (mr) Kg- প্রাণিহত্যা, চুরি (অদত্ত গ্রহণ) এবং পরদার লঙ্ঘন (অবৈধ কামাচার)এ ত্রিবিধ কায়িক অকুশল কর্ম হতে বিরত হওয়াকে সম্যক (সৎ) কর্ম বলে।

সৎকর্ম হচ্ছে যার মধ্যে পবিত্রতা নিহিত আছে। বাক্য সংযমের ন্যায় দৈহিক কর্মও সংযম করতে হয়। এজন্য হিংসা ত্যাগ করে সকল জীবের প্রতি অহিংসভাব প্রদর্শন করতে হয়। চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যা কামাচার ও নেশাদ্রব্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করে সচ্চরিত্র গঠন করতে হয়। সেই ব্যক্তি দৈহিক সংযমের সীমা লঙ্ঘন করেন না। এরূপ পবিত্র কর্মা নর-নারী অপরকে দণ্ডদানে বিরত হয়ে লজ্জাশীল, দয়ালু এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়ে বিহার করেন।[১৬] তিনি অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত হয়ে, অচৌর্যবৃত্তি ও সূচিসম্পন্ন হয়ে অবস্থান করেন। তিনি মাতৃ-রক্ষিতা, পিতা-রক্ষিতা, ভ্রাতৃ-রক্ষিতা, ভগ্নি, জাতি- ধর্ম রক্ষিতা হয়ে অন্য স্ত্রীর সাথে ভ্রমেও কামাচারে রত হন না। সর্ব প্রকার অসৎ কর্ম বর্জন করে যাবতীয় কুশল কর্ম সম্পাদন করার নামই সম্যক কর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ও নেশাদ্রব্য পান থেকে বিরত থাকা যে কর্ম তাই সৎ কর্ম।

5. mg¨K RxweKv- এটা হচ্ছে নির্দোষ জীবিকা। যে কোন পুরুষ অথবা নারী সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। এমন কি প্রাণ রক্ষার জন্যও তিনি অসদুপায় অবলম্বন করবেন না। প্রাণী, অস্ত্র, মাংস, বিষ ও নেশা জাতীয় ব্যবসা সদজীবন নয়।[১৭] উক্ত পাঁচ প্রকার ব্যবসা যারা করে তাদের মনোবৃত্তি হীন পর্যায়ের। এগুলো থেকে বিরত থাকা বুদ্ধের দেশিত পঞ্চশীলের অন্তর্গত। এ ব্যবসার অপকারিতা ভয়াবহ। বস্তুত এ জাতীয় ব্যবসায়ীদের অন্তর সব সময় কলুষিত থাকে। কখনো সত্যকারের চিন্তা উদয় হয় না। নেশায় আসক্ত মানুষের জীবন ব্যাধপার্শ্বে আবদ্ধ পাখির ন্যায় নিত্য দারুণ বিপদসংকুল। এ সমস্ত ব্যবসায়ীরা পাপকর্মের মূল হোতা। সাধুসজ্জন ব্যক্তি পরের অনিষ্টকর জীবিকা সর্বদা বর্জন করেন। সৎ পুরুষ কখনো কুহনা, প্রতারণা, লবনা, প্রবঞ্চনা, নৈমিত্তিকতা, নিষ্পিড়তা দ্বারা জীবিকার্জন করেন না। তিনি অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, মদ ও বিষ- এ পাঁচ প্রকার ব্যবসা পরিত্যাগ করে কৃষি, সৎ ব্যবসা, শিক্ষকতা, চাকুরী ইত্যাদি সৎ জীবিকা দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করেন। তিনি অহিংসা, অচৌর্য, অপ্রবঞ্চক, অমায়াবী হয়ে জীবিকার্জন করেন।

6. mg¨K e¨vqvg (c‡Póv)- এটা সৎ প্রচেষ্টা বা সৎ উদ্যম। সৎ প্রচেষ্টা চার প্রকার: যথা- ক. অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপাদনের প্রচেষ্টা, খ. উৎপন্ন কুশল বিনাশের জন্য উদ্যম। গ. অনুৎপন্ন কুশল উৎপন্নের প্রচেষ্টা, ঘ. উৎপন্ন কুশল পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা।

সাধন মার্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য উদ্যমের প্রয়োজন। সাধককে শত বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। 'বিরিয়েন কিমসাধনীয়ং'- বীর্য বা উৎসাহ দ্বারা সাধন করা যায় না এমন কোন কাজ নেই। দৈহিক, মানসিক সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা, উচ্চতর সৎকর্মের মননশীলতা, চিত্তশুদ্ধি ও প্রবল অধ্যবসায় হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম বা সৎ উদ্যম। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি এ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেনা। বোধিদ্রুমমূলে বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধের পূর্বাবস্থা) দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় ছিল। এ অধ্যাবসায়ের গুণেই নিজের প্রচেষ্টা বা উদ্যমের ক্ষেত্রে বীর্যকে আরো গতিশীল করতে হয়। বীর্য হচ্ছে মানুষের জন্য স্তম্ভ সদৃশ।[১৮] মানুষ বা সাধক স্মৃতিভ্রষ্ট হলে বীর্য তার গতি (দৃঢ় মনোবল) সঞ্চার করে। অল্প সংখ্যক সেনা বহুসংখ্যক সৈন্যের নিকট পরাজিত হতে দেখে রাজা আবার তাদের পেছনে সৈন্য পাঠালে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তদ্রুপ বীর্য স্মৃতি উপধারক।

সাধক নিজের গুণেই নিজের বিমুক্তি অর্জন করেন। স্বাবলম্বন ও দৃঢ় বীর্য এর আদর্শ। এতে সর্বপ্রকার দুর্বলতা অপসারিত হয়।

7. mg¨K ¯§wZ- স্মৃতি হচ্ছে যথাযথ পর্যবেক্ষণ। দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার অবস্থা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ বা স্মরণই সম্যক স্মৃতি। এতে চিত্ত সৎকর্মে নিবিষ্ট হয়। স্মৃতিহীন চিত্ত বা মন কর্ণধারবিহীন তরণীয় ন্যায় বিপন্ন। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন- ''সতিঞ্চ খ্বাহং ভিক্খবে সব্বত্থিকং বদামি'' অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! আমি বলি স্মৃতি সর্বার্থ সাধক। স্মৃতিকে "সর্বার্থসাধিকা" বলা হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শে মোহ ও প্রমাদে উন্মোক্ত তৃষ্ণার উৎপত্তি নিবারণে স্মৃতির সতর্কতা অবলম্বন, দৌবারিকের কাজ করে। এ কারণে উন্নত জীবন গঠনে সর্বদা সৎ স্মৃতি আবশ্যক। এতে চিত্ত মোহ ও প্রসাদ (উচ্চবিলাস) অপসারিত করে।

8. mg¨K mgwa- সমাধি শব্দের অর্থ হচ্ছে চিত্তের একাগ্রতা সাধন। একাগ্রতা বিশেষত অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম সাতটি অঙ্গসমন্বিত চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। সম্যক দৃষ্টি থেকে সম্যক স্মৃতি সাধকের ক্ষেত্রে অঙ্গীভূত। কারণ এগুলোর প্রতিফলন না হলে সমাধিতে রত থাকলেও চিত্তের উত্থানে পতন ঘটে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত সমাধির অন্তরায়। পরিশীলিত জীবনই এর ধারাবাহিকতা। মানুষের চঞ্চল, ইতস্তত: বিচরণশীল উৎক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযম করতে না পারলে জগতে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে, সকল কুশল কর্মই সমাধিমুখ, সমাধিনিম্ন এবং তদবস্থায় স্থিত।[১৯] রণক্ষেত্রের হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক

প্রভৃতি যুদ্ধ-সজ্জা যেমন রাজাকে রক্ষার জন্য নিয়োজিত হয়, সেরূপ সকল প্রকার কুশলই সমাধিমুখ, সমাধি নিম্ন এবং তদবস্থায় স্থিত, সমাধিস্থ ব্যক্তিই যথাযথ জ্ঞাত হন।

''সমাধির লক্ষণ প্রমুখ অর্থাৎ প্রধান। যে সকল কুশল ধর্ম আছে, সে সকল সমাধি অভিমুখী, সমাধি নিম্ন, সমাধি প্রবণ এবং সমাধির প্রতি অবনত হয়।''

উপমা স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন রাজা চতুরঙ্গনী সেনার সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, তবে হস্তী, অশ্ব রথ ও পদাতিক সমস্ত সেনাই তদভিমুখী হয়, রাজার দিকে নত হয়, তৎপ্রবণ হয়, তাঁর দিকে অবনত হয় এবং রাজাকেই পুরোভাগে রেখে অগ্রসর হয়, এরূপই মহারাজ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে, তা সমাধি প্রমুখ, সমাধি নিম্ন, সমাধি প্রবণ, সমাধির দিকে অবনত। মহারাজ! এরূপে সমাধি লক্ষণ প্রমুখ (প্রধান)। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন- ''ভিক্ষুগণ! সমাধির ভাবনা কর; সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত (যথা সত্য) জেনে থাকে।''[২০]

সমাধি চার প্রকার : যথা- প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান। প্রথম ধ্যানরত সাধকের ভোগ স্পৃহা ত্যাগ করা কর্তব্য। কারণ, অত্যধিক ভোগস্পৃহা পরায়ণ চিত্ত সমাধিস্থ হয় না। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা- চিত্তের এ পাঁচটি অবস্থাই বর্তমান থাকে। দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক, বিচার উপশান্ত হয়ে চিত্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। সাধক চৈতসিক প্রসাদ লাভ করে। চিত্তে বলবতী শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তার চিত্ত প্রীতিতে আপ্লুত হয়। তৃতীয় ধ্যান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক, বিচার ও প্রীতির অবসান হয়। সাধক উপেক্ষা জনিত কায়-সুখ অনুভব করেন। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি শারীরিক সুখ-দুঃখ এবং মানসিক সৌর্মনস্য দৌর্মনস্য পরিহার করে চতুর্থ ধ্যান লাভী হয়ে বিহার (অবস্থান) করেন। চিত্তই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপযোগী।

Dhaka University Institutional Repository

cZxZ¨mgrcv‘ bxwZ

বিদর্শনে চিত্তশান্তি ও তৃষ্ণাক্ষয়ে মুক্তিলাভ

1. Ignorance
2. Activities
3. Rebirth Conciousness
4. Mind & Matter
5. Six Sense Spheres
6. Contact
7. Feeling
8. Craving
9. Attachment
10. Existence
11. Birth
12. Decay & Death

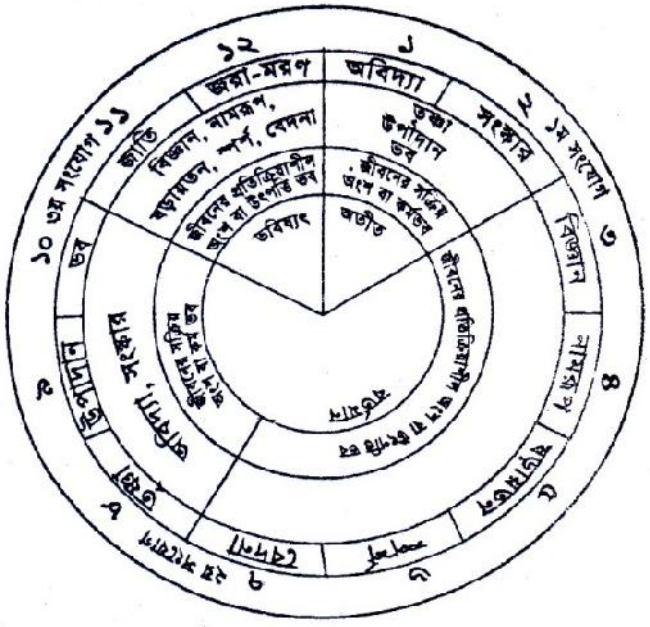

জীবন-চক্র

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বলতে কার্য-কারণ নীতিকে বোঝায়। কার্য-কারণ তত্ত্ব দর্শন জগতের একটি জটিল সমাধান। সকল পদার্থই কার্য-কারণ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন হচ্ছে। ওই নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। জড় ও জীবজগৎ কার্য-কারণ নীতির প্রবাহ মাত্র। বিজ্ঞানীরাও জড় ও মনোজগৎ সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন। কার্য সর্বদা কারণ সাপেক্ষ। কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণের নিয়ামকতাই কার্যকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধ এই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করেছেন।

বুদ্ধ বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমার জোৎস্নারাতের প্রথম প্রহরে লাভ করেন জাতিস্বর জ্ঞান; দ্বিতীয় প্রহরে জানতে পারলেন পূর্বজন্ম- বৃত্তান্ত এবং শেষ প্রহরে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করে সর্বজ্ঞতা লাভ করেন।

বুদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করে এক সপ্তাহ যাবৎ আবার ধ্যানে বসে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের অনুলোম-পটিলোম (উদয়-বিলয়) ভাবনা করে সপ্তাহের শেষ দিন সূর্যোদয়ে ধ্যান হতে ওঠে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন–

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্স উপ্পাদা ইদং উপজ্জতি;
ইমস্মিং অসতি, ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা, ইদং নিরুজ্ঝতি।[২১]

ওটা থাকলে এটা হয়, ওটার উৎপত্তিতে এটার উৎপত্তি; ওটা না থাকলে এটা হয় না, ওটার নিরোধে এটার নিরোধ হয়।

এটাই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মূলসূত্র। জড়জগত ও মনোজগত- এ নীতি দ্বারাই পরিশাসিত হচ্ছে। হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ।[২২]

জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদঘাটন করে সেই বজ্রাসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই তথাগত বুদ্ধ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–

যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা
আতাপিনো ঝায়তো ব্রাহ্মণস্স,
অথস্স কঙ্খা বপয়ন্তি সব্বা
যতো পজানতি সহেতু ধম্মন্তি।[২৩]

"সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়।
দূরে যায় সর্ব শংকা-সকল সংশয়,
জ্ঞানে যাহে হেতুবশে ধর্ম সমুদয়।"

যদি এ কারণটি থাকে, তাহলে এ ফলটি হয়। এটির সৃষ্টি হলে এটিও সৃষ্টি হয়। হেতুর উৎপত্তিতে ফলোৎপত্তি হয়, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ হয়। এভাবে দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখের নিরোধ হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পরিসমাপ্তি হয়। এ উদয় বিলয়ের অন্তসাধনই নিবৃত্তি বা নির্বাণ। বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায়

উদ্ভাবন করতে গিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার নাম আর্যসত্য যার মধ্যে নিহিত আছে হেতু (দুঃখ), উৎপত্তি (তৃষ্ণা) ও নিরোধ (নির্বাণ) ও নির্বাণ লাভের উপায়- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

প্রতীত্য বা প্রত্যয় (কারণ) সহযোগে ধর্মসমূহ উৎপন্ন হয়। এ ধর্মসমূহ এক অপরের সাথে সম্পৃক্ত। একটি উৎপন্ন হলে অন্যটিও উৎপন্ন হয়। আবার একটি ধ্বংস হলে অন্যটিও ধ্বংস হয়। একে প্রতীত্য সমুৎপাদ বা দ্বাদশ নিদান (হেতু) বলা হয়। দ্বাদশ নিদান নিম্নরূপ:

1. Awe¾v ev Awe‘¨v

অবিদ্যা হচ্ছে দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা কোন বিষয়ের যথার্থ স্বভাব জানতে দেয় না। বরঞ্চ এর বিপরীত বোধের সৃষ্টি করে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে একত্রে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়, যার অপর নাম নামরূপ (দেহ ও মন)। জীবন ক্ষণস্থায়ী, অথচ এ বিষয় কেউ চিন্তা করে না। করলেও পর মুহূর্তে আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। অবিদ্যা আপন চক্রে বারবার ঘুরে।[২৪]

2. msLvi ev ms¯‹vi

অবিদ্যার কারণেই সংস্কার উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, কথা বলে তখন তার চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে নতুন ভাবের সৃষ্টি হয়। চিত্তের এ নতুন ভাব বা চেতনাকেই সংস্কার বলে। চেতনাই ভালো-মন্দে পুঞ্জীভূত হয়ে সংস্কারে পরিণত হয়। চেতনার অপর নাম কর্ম, এর ফলে চিত্তের ওপর চেতনার প্রভাবে কার্যাদি সম্পন্ন করে। সৎ ও অসৎ মনোবৃত্তিই সংস্কার।

3. weTTvb ev weÁvb

সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মনে সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে আবার নতুন কারণ উদ্ভব হয়। রূপের সাথে চক্ষু, শব্দের সাথে শ্রবণ, গন্ধের সাথে ঘ্রাণ, রসের সাথে জিহ্বা এবং ভাবের সাথে মন সম্মিলিত হয়। তখন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চিত্তের সংস্কারজাত প্রভাবের উপর আবার ফলোদয় হয়ে বিজ্ঞানে পরিণত হয়।

4. bvg-iƒc

বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ উৎপন্ন হয়। নাম বলতে সত্ত্বার সূক্ষ্ম বা মানসিক অংশ এবং রূপ বলতে স্থূল বা কায়িক অংশ বুঝায় অর্থাৎ কায় ও মন- এ দুটির সমন্বয়ে জীব। দেহ ও মনকে পৃথক এবং স্বতন্ত্রভাবে বিচার না করে একই বস্তুর দুটি রূপ হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। মন ছাড়া দেহ যেমন অচেতন পদার্থ মাত্র, তেমনি দেহ ছাড়া মন অচেতন। একটি ছাড়া অন্যটি চলতে পারে না। নৌকা ও মাঝি সদৃশ। তাই উভয়ে পরস্পরাশ্রিত। মনের উদয় হলে দেহ বিদ্যমান থাকে। তাই বিজ্ঞানের উদয়ে নামরূপের উৎপত্তি হয়। বস্তুত নাম হচ্ছে চিত্ত বা মন এবং রূপ হচ্ছে ভৌতিক দেহ। সুতরাং ইন্দ্রিয় নিচয় এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয়সমূহ নামরূপের অন্তর্ভূক্ত।

5. mjvqZb ev lovqZb

নামরূপের কারণে ষড়ায়তন উৎপন্ন হয়। ষড়ায়তন বলতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনকে বুঝায়। নামরূপ বা চিত্ত (মন) তার বাহন। দেহ উৎপন্ন হওয়ার সাথে তাদের কাজ করার জন্য ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে মন প্রধান। মনের সাহায্য ছাড়া মানুষ মাত্রই অকেজো হয়ে পড়ে। দেহ ও মন থাকলে ষড়ায়তন বিদ্যমান থাকবেই।

6. dmm ev ¯úk

ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ উৎপন্ন হয়। স্পর্শ বলতে সংযোগ বা মিলনকে বলে। ষড়েন্দ্রিয় বস্তুর সংশ্রবে আসলেই স্পর্শের উৎপত্তি ঘটায়। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ থাকে। স্পর্শের দ্বারা ঘটনাসমূহের অভিজ্ঞতার সঠিক ছাপ গ্রহণেও সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য করে। স্পর্শ ছাড়া সঠিক ধারণা লাভ করা যায় না। চক্ষু আছে বলেই সবকিছু দৃশ্যপটে আসে, নতুবা সবাই অন্ধ। কর্ণ আছে বলেই শুনতে পায়।

7. †e‘bv ev AbfwZ

স্পর্শ থেকে বেদনার সৃষ্টি হয়। অনুভূতি ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ। কোন ব্যক্তি পুণ্যকর্ম করে দেহত্যাগের পর সুগতি পরায়ণ হয়ে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে তথায় দিব্য পঞ্চকাম উপভোগ করে। তার মনে এরূপ চিন্তা হয় 'আমি পূর্বে পুণ্যকর্ম করেছি। সে কারণেই আমি এরূপ সুখ ভোগ করছি। এরূপ অনুভব ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ।[২৫] জীবনে চলার পথে স্পর্শ না থাকলে বেদনা অনুভব করা

যায় না। স্পর্শ হচ্ছে মানসিক ক্রিয়া-ইন্দ্রিয় নিচয়ের সংস্পর্শে বেদনার উৎপত্তি। বেদনা তিন প্রকার: সুখ বেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষাবেদনা অর্থাৎ সুখও নয়, দুঃখও নয়। ষড়েন্দ্রিয় ও স্পর্শ- এ দুয়ের সংস্পর্শে সুখের হোক বা দুঃখের হোক - বেদনা উৎপন্ন হচ্ছে।

8. ZYnv ev Zòv (Avmw³)

বেদনার কারণে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দেখে কীট পতঙ্গ যেমন প্রলুব্ধ হয়, তদ্রূপ জীবমাত্রেই বেদনা বা রসানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে তৃষ্ণায় বশীভূত হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক-কার্য সম্পাদন করে। মন তার প্রদুষ্ট স্বভাব ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সহযোগে কামভোগে আসক্ত করে। মনের সেই অবস্থার ওপরেই সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। তৃষ্ণাকে কামোপাদানের উপনিশ্রয় বলা হয়। রূপ, শব্দ, গন্ধাদি আলম্বনে তৃষ্ণা ক্রমশ পরিপক্ক হয়ে প্রবল কামোপাদানরূপে পরিণত হয়।[২৬] তৃষ্ণা তিন প্রকার: কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। কামরসসিক্ত তৃষ্ণাকে কামতৃষ্ণা, জগত নিত্য ও ভাবাবেগ উৎপন্ন তৃষ্ণা হচ্ছে ভব তৃষ্ণা এবং এ ভৌতিক দেহ জন্মীভূত হলে আর জন্ম হবে না- এটাই হচ্ছে বিভব তৃষ্ণা।

9. Dcv‘vb

তৃষ্ণার কারণে উপাদান উৎপন্ন হয়। ভোগে তৃষ্ণা মিটে না। যতই ভোগ করা হোক না কেন তৃষ্ণা যেন অপূর্ণ থেকে যায়। ঘৃতসিদ্ধ আগুনের মত আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মনের উদ্দম ভাবই উপাদান। ফলে উপাদান বিষয়কে আবদ্ধ করে। তৃষ্ণা যখন প্রবল হয়, তখন তা উপাদানে পরিণত হয়। উপাদান চার প্রকার: কাম-উপাদান (ইন্দ্রিয় সম্ভোগ) দৃষ্টি- উপাদান (মিথ্যা ধারণা), শীলব্রত-উপাদান (আচার-অনুষ্ঠানই সঠিক পথ) এবং আত্মবাদ- উপাদান (শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাসী)।

10. fe ev DrcwË (gvZRv‡i Drcb)

উপাদানের কারণে ভবের উৎপত্তি। হওয়ার আকাঙ্খায় কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয় বলে ভব। ভব দুই প্রকার: কর্ম-ভব ও উৎপত্তি ভব। কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম, সংস্কার প্রভৃতি কর্মভব এবং কর্ম দ্বারা উৎপন্ন ভবই উৎপত্তি-ভব। উপাদানই বর্তমান কর্মভব এবং পরজন্মই উৎপত্তি-ভব। এটা জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ।

11. RwZ-Rb¥

ভবের কারণে জাতি বা জন্ম হয়। জন্ম বলতে মাতৃজঠরে উৎপত্তি বুঝায়। প্রতিসন্ধিক্ষণে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে 'নামরূপ' আখ্যাত হয়ে মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হয়। কর্মভবই প্রতিসন্ধির বা উৎপত্তির কারণ। নদীর স্রোতের ন্যায় এ গতি চলতে থাকে। এ প্রবাহ কার্য-কারণ নির্ভর। চিত্ত-প্রবৃত্তি হেতুবশে ক্রিয়াশীল হয়ে আবার পুনর্জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

12. Riv, giY, †kvK, cwi‡'eb, 'tL BZ¨w'

জন্মের কারণে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। জন্ম বা ব্যক্তির শারীরিক অভিব্যক্তি অনিত্য ও অসার বিধায় পরিণামে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ বিষাদ, হতাশা প্রভৃতি আনায়ন করে। এটিও উৎপন্ন বশে ধারাবাহিকভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কারণ নীতির অন্তর্গত। অবিদ্যা নিজ চক্রে দ্বাদশ অঙ্গে বারবার ঘুরছে। এ কারণে প্রতীত্যসমুৎপাদকে ভবচক্র নামেও অভিহিত করা হয়। বুদ্ধ এ ভবচক্রের ওপর ভিত্তি করে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের যে দেশনা করেছিলেন তাকে "ধর্মচক্রপ্রবর্তন" সূত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্য-কারণ তত্ত্ব বিশ্বে বুদ্ধের অমর দান। মনীষী নিউটন যেমন একটি আতা ফলের ভূপতন রূপ অতি সচরাচর ঘটনার মধ্যে জড়-জগতের মহাসত্য মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বুঝতে পেরেছিলেন, তেমনি তাঁর বহু শতক আগে তথাগত বুদ্ধ দুঃখমুক্তির পথ পরিক্রমায় দ্বাদশ নিদান বা প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

wbevY

fwgKv

মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূল লক্ষ্য হল নির্বাণ। এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হওয়া। অর্থাৎ ভবচক্র বা জন্ম-মৃত্যুর দুঃখকর ক্রমাবর্তন থেকে চিরমুক্তি লাভ করা। তৃষ্ণা বা কামনার বশবর্তী হয়ে জীব ভব হতে ভবান্তরে বারবার জন্ম নিয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে পারলে দুঃখ নিরোধ হয়। এই ভবচক্ররূপ দুঃখ থেকে যিনি মুক্ত হন তিনি নির্বাণগামী। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপী দুঃখময় ভবচক্রের পূর্ণ নিরোধই হল নির্বাণ।

wbevY k‡ãi Zvrch

পালি 'নিব্বান', বাংলা 'নির্বাণ' শব্দটি 'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' শব্দ সহযোগে নির্বাণ পদ সিদ্ধ হয়। এখানে 'বাণ' শব্দ তৃষ্ণা বা বন্ধন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তৃষ্ণা অপরাপর অনুসরণের সাথে যুক্ত হয়ে মানুষকে ভব হতে ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ করায়। মানুষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করে। এজন্য তৃষ্ণাকে 'বাণ' নামে অভিহিত করা হয়। 'বাণ' শব্দের অর্থ 'তীর'ও হতে পারে। রাগ, দ্বেষ, মোহসঞ্জাত 'ক্লেশতীর' বর্তমান না থাকায়, একে নির্বাণও বলা হয়। 'নি' উপসর্গের দ্বারা তৃষ্ণা বা দুঃখের অভাব সূচিত হয়। যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হয় বলে তাকে নির্বাণ বলে।

'ণ' সহযোগে 'বাণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নি। এ অর্থে নির্বাণ 'শব্দের অর্থ হচ্ছে রাগাগ্নি = লোভাগ্নি = দ্বেষাগ্নি- এ তিনটির চিরতরে নির্বাপণ অর্থে 'নির্বাণ' গৃহীত হতে পারে। তথাগত বুদ্ধ বলেছেন-

- হে ভিক্ষুগণ! এ জগত প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে।

এ জগত কিসের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে? এ জগত রাগাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, দ্বেষাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে, মোহাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। এ জগত জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, পরিবেদন, দৌর্মনস্য এবং হতাশারূপ অগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে।

নির্বাণ কেবলমাত্র রাগদ্বেষাদি অগ্নির চিরতরে নির্বাপণ নয়; উপায়ও উপেয়কে একাত্মক করলে হবে না; রাগদ্বেষাদি অগ্নির চিরতরে নির্বাপণকে বুঝতে নির্বাণ লাভের উপায়কে বুঝতে হবে। এ স্রোতে পতিত হলে আর বিপরীতমুখী হবার সম্ভাবনা থাকেনা।[27] তৃষ্ণারূপ বন্ধন নিরোধ অর্থে 'নির্বাণ' বুঝায়। অবিদ্যা, তৃষ্ণার নিরোধ হয়ে জন্ম-মৃত্যু বন্ধ হয় বলে নির্বাণ। শেষ হয়েছে- এ অর্থে নির্বাণ।

wbev‡Yi ZËMZ A_

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন- ‘জন্ম-জরা-ব্যাধি, মরণ দুঃখময়। অর্থাৎ বার বার জন্মগ্রহণ করা যেমন দুঃখকর, তেমনি মৃত্যুতে দুঃখের কারণ। কেননা মৃত্যুতে দুঃখের অবসান হয়না। পুনর্জন্ম তাকে নিতেই হয়। কেন এই পুনর্জন্ম? তৃষ্ণা কামনা-বাসনাই এর প্রধান কারণ। এজন্য প্রয়োজন তৃষ্ণার পূর্ণ বিনাশ সাধন। তৃষ্ণার বিনাশ হলে পুনর্জন্ম রোধ হয়। জন্ম যার নেই মৃত্যু তার থাকার কথা নয়। জন্ম-মৃত্যুর এ লীলা খেলাকে বৌদ্ধ পরিভাষায় বলা হয় ভবচক্র। এর থেকে মুক্ত না হলে দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটেনা। সুতরাং ভবচক্রের হাত থেকে মুক্তি লাভের দ্বারা দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তিই হল নির্বাণ।

সত্ত্বদিগের সংসারের ফলে কারণ নিরোধ হওয়াকে নির্বাণ বলে। তৃষ্ণার কারণ নিরোধ হওয়াকে নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়।[২৮]

নির্বাণ শান্ত লক্ষণযুক্ত। দুঃখের উপসমতাই এর স্বভাব; অচ্যুতি এর রস বা কৃত্য। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম রুদ্ধ। তাঁর তথা হতে চ্যুত হবার কোন ভয় নেই। তা অচ্যুত, জ্ঞানগ, অচ্যুতি, অনিমিত্ততা হেতু এর কোন পদস্থান নেই। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন–

“পদমচ্চুত মচ্চন্ত অসংখতমনুত্তরং,
নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসয়া।”

তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও বুদ্ধের শ্রাবকবৃন্দ অচ্যুত, অসংস্কৃত, অকার্যকরণ সংযুক্ত, অনুত্তর শান্তিপদকে নির্বাণ বলে অভিহিত করেছেন।

যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা-বন্ধন নিরবশেষভাবে ছিন্ন হয় তাকে নির্বাণ বলে।

wbevY m¤ú‡K e‡×i Dw³

নির্বাণকে যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন এর অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু ততটা সহজবোধ্য নয়। সম্ভবত এ কারণে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গের নিকট নির্বাণের সরাসরি কোন ব্যাখ্যা তুলে ধরেননি। নির্বাণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত গাথায় যা প্রকাশ করা হয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ:

বিঞ্ঞাণস্স নিরোধেন তণ্হাং বিমুত্তিনো,
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খ হোতি চেতসো।

বাংলা অনুবাদ: 'প্রজ্জলিত অগ্নি নিভে যাওয়ার ন্যায় তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান নিরোধের দ্বারা বিমুক্ত পুরুষের চিত্ত মোক্ষ (নির্বাণ) লাভ করে। তাঁর পুনর্জন্ম সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়।'

মহাপরিনিব্বান সুত্ত- এ বুদ্ধ অপর এক গাথায় বলেছেন–

'যো ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে অপ্পমত্তো বিতস্সতি,
পহায জাতি সংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতী'তি।

evsjv Abev'

'বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্ম বিনয়ে যিনি বিচরণ করেন– সেই অপ্রমত্ত পুরুষ ভবচক্র অতিক্রম করে সকল দুঃখের অন্তঃসাধন করেন।'

বুদ্ধভাষিত উপরোক্ত গাথা দু'টির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– তৃষ্ণাক্ষয় ও বিজ্ঞান নিরোধের দ্বারা ভবচক্র নামক অন্তহীন দুঃখ থেকে চিরমুক্তিকেই তথাগত বুদ্ধ নির্বাণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

wbev‡Yi cKvi‡f'

নির্বাণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: ১. সোপাদিশেষ নির্বাণ ও ২. অনুপাদিশেষ নির্বাণ।

1. †mvcvw'‡kl wbevY- (m+Dcvw'+‡kl)

নিজ দেহ স্থিত থেকে পরিনির্বাণ, সুখ অনুভব, নিরাসক্ত নির্বাপন অর্থাৎ অর্হৎগণের জ্ঞান লাভের পর হতে আয়ুষ্কাল পর্যন্ত নিজের দেহে বর্তমান থেকে দমিত ভাবাবেগে অনাসক্তরূপে জীবনযাপন। অর্হৎগণ অর্হত্বজ্ঞান লাভের পর হতে দেহত্যাগের পরিনির্বাণ (মহাপ্রয়াণ) লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধরাতলে ধ্যানাবস্থায় নিজদেহে স্থিত থেকে যে তৃষ্ণাবিরহিত সর্বপ্রকার নিবৃত্তিমূলক নির্বাণ সুখ করতে থাকেন, এটাই সোপাদিশেষ নির্বাণ।[২৯] সংক্ষেপে বলতে গেলে, উপাদানসমূহ (দেহ ও মন) বর্তমান থাকতে ক্লেশসমূহ বিধ্বংস করে অর্হৎ হয়ে নির্বাণ উপলব্ধির নাম সোপাদিশেষ নির্বাণ। তথাগত বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ নির্বাণে নিবৃত হন।

2. Abcw‘‡kl wbevY- (Ab+Dcw‘+†kl)

অর্হতদের দেহত্যাগে স্কন্ধ ও আসক্তিমুক্ত পরিনির্বাণই অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ। তৃষ্ণা বা আসক্তির অনুরাগবশত যার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধ চঞ্চল হয় না, চিরতরেই নিরুদ্ধ হয়ে যায়, এরূপ মহাপুরুষের পুনর্জন্ম বিরহিত দেহত্যাগই অনুপাদিশেষ নির্বাণ। যার নির্বাণ পথে বা দেহত্যাগে পুনর্বার জন্মগ্রহণের কোন হেতু অবশিষ্ট থাকে না, নিরবশেষ নির্বাপনই পরিনির্বাণ।[৩০] সোপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যখন পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধন করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণ উপলব্ধি করেন। গৌতম বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে কুশীনগরে যখন শালতরুতলে মহাপ্রয়াণ করেন তখন তিনি অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন।

নির্বাণ বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ সবকিছুর মূলে রয়েছে নির্বাণ প্রত্যক্ষকরণ। নির্বাণ বুদ্ধসাধনার পরম প্রাপ্তি। দুঃখ থেকে চিরমুক্তির এক নাম নির্বাণ। তৃষ্ণার নিবৃত্তিই নির্বাণ। যেখানে সংসার স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়েছে, আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, সেই পরম অবস্থাই নির্বাণ।

নির্বাণ অব্যক্ত, অনির্বচনীয় ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জ্ঞানগম্য। এ অনির্বচনীয় মিশ্রবস্তুকে বুঝতে হলে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত জাগতিক পদার্থসমূহের যথার্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সাংসারিক বস্তু ও প্রাণীর স্বভাব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হলেই অনির্বচনীয়, অব্যক্ত নির্বাণের ধারণা করা সম্ভব। অতএব জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ধম্মপদ-এ বলা হয়েছে-

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।[৩১]

যাবতীয় সংস্কার অনিত্য- এটা যখন লোকে প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি দুঃখের প্রতি বিরাগপ্রাপ্ত হন, এটাই বিশুদ্ধিমার্গ।
এভাবে সংসার অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম উপলব্ধি করতে হয়।

সংসারের জীব-বস্তুসমূহ নিত্য নয়। সর্বদা পরিবর্তনশীল। জীব ও জগৎ যেখানে অনিত্য, সেখানে সারবস্তুর অস্তিত্ব কোথায়? স্থূল দেহ ও মন উভয়ই যখন অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর-ঐ দুটির একটিকে শাশ্বত আত্মা বলে কল্পনা করা অযৌক্তিক নয় কী? শরনির্মাতা তীরের ফলাকে যেমন সোজা করে, তেমনি পন্ডিত

ব্যক্তিগণ চঞ্চল চিত্তকে সংযত করেন।[৩২] মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য ও চিত্তসংযম অভ্যাস করত ধ্যানের দ্বারা বিপথগামী চিত্তকে সুপরিচালিত করতে পারলে নির্বাণ লাভ করা সম্ভব।

নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যা সর্বোপরি বিবর্জিত ও সর্ব সংস্কার বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকার মালিন্য ওকে স্পর্শ করতে পারে না। ধম্মপদ-এ বলা হয়েছে:

আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং,
বিস্সাস পরমং ঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং।[৩৩]

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বস্ত লোকই পরমাত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

বহুদিন ধরে রোগে পীড়িত মানুষের পক্ষে নির্বাণই পরম সুখ। কারণ, পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত দেহ ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এমন এক প্রকার দুঃখ যা হতে ত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। আজীবন ক্ষুধা, তৃষ্ণার তাড়নায় মানুষ অস্থির। ক্ষুধা, তৃষ্ণা মানুষের নিত্য রোগ সদৃশ। এরূপ ক্ষুধা-তৃষ্ণা হতে ত্রাণ পাওয়া সত্যি পরম সুখ। নির্বাণে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন জ্বালা নেই।

বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুন বলেছেন–

"অপ্রহীনম্ অসম্ প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নং অশ্বাশ্বতম্।
অসিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এতং নির্বাণং উচ্যতে॥"

চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্ত সন্ততির এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যা প্রতীতির অতীত। উহা কোন উপায়ে লভ্য নহে; কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদও নয়। নির্বাণের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই অসম্ভব। এজন্য একে নির্বাণ নামে অভিহিত করা হয়।

নির্বাণ পরম সুখকর। নির্বাণ পরম শুভ। প্রত্যেক বস্তুই সংস্কৃত ও অসংস্কৃত ভেদে দুই প্রকার। যার কার্য-কারণ অভূত তাই সংস্কৃত। নির্বাণ অসংস্কৃত। সুতরাং এটা পরিবর্তনশীল নয়। পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্বই দুঃখজনক। নৈর্বাণিক আনন্দের স্থায়িত্ব বর্তমান। এজন্য এটা পরম সুখদায়ক।

নির্বাণ অকারণ সম্ভূত। নির্বাণের উৎপত্তি নেই। অনুৎপন্ন বস্তুর বিনাশ কোথায়? এটা অপরিনামশীল, অবিনশ্বর ও কালাতীত। সুতরাং তা ধ্রুব। এটা সংস্কৃতের বিপরীত অসংস্কৃত, অসংস্কৃত বলেই এটা শুভ। ধ্রুব ও শুভ বস্তু পরম সুখকর। এজন্য তথাগত বুদ্ধ সিংহনাদ উচ্চারণ করে বলেছেন-

"বিস্সাসং পরমং ঞাতি, নিব্বানং পরমং সুখং।"

-বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ।

বুদ্ধ আরো বলেছেন- নির্বাণ শ্রেষ্ঠ (নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধো) এবং নির্বাণ অনুত্তর যোগক্ষেম (যোগক্খেমং অনুত্তরং)। দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু মানুষের কল্পনায় সম্ভব তার মধ্যে নির্বাণই সর্বশ্রেষ্ঠ। দেব-মানবের কল্পনায় এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। যোগীরা তা লাভ করার জন্য সাধনা করে থাকেন। নির্বাণ এক অমৃত পদ যা পরম শান্তিপদ এবং পরম সুখকর। এটা অদুঃখ, অসুখ, অজর, অমর, অব্যাধি; বর্জিত চিত্তের এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থা যা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও বিজ্ঞান এরূপ পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করতে পারলেই তা অনুভূত হয়। নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তি শমথ ও বিদর্শন ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সংশয়-মুক্ত ও অনাসক্ত হয়ে বিহার করেন।

সংযুক্ত নিকায়-এর নির্বাণ-প্রশ্ন সূত্রে[৩৪] জম্বু খাদক পরিব্রাজক সারিপুত্র স্থবিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– 'আবুসো (বন্ধু), নির্বাণ, নির্বাণ বলা হয়। আসলে নির্বাণ আছে কি? 'আবুসো-রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়কে নির্বাণ বলা হয়। বন্ধু, এ নির্বাণ অধিগত হওয়ার জন্য মার্গ বা প্রতিপদা আছে।' বন্ধু, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বাণ সাক্ষাৎ করার মার্গ বা প্রতিপদা। একই গ্রন্থের নির্বাণানুকূল সূত্রে[৩৫] বলা হয়েছে- 'অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম- এ তিনটি হচ্ছে নির্বাণের অনুকূল ভাবনা বা দেশনা।

উক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায়, যাঁরা রাগ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয় করেন, তাঁরা নির্বাণ লাভে সমর্থ এবং নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়- নির্বাণ বলতে প্রশান্তি বা শূন্যতাকে বুঝায়।

পন্ডিতেরা সকল পদার্থকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন: সংস্কৃত ও অসংস্কৃত যা কার্য-কারণ সম্বন্ধ সজ্ঞাত তা সংস্কৃত। যা সংস্কৃত হয়নি, তা অসংস্কৃত। এটাই নির্বাণ। বুদ্ধ সংস্কৃত ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন– "হে ভিক্ষুগণ, এর উৎপত্তি, বিনাশ এবং উভয়ের মধ্যে স্থিতির অন্যথা অবস্থা দেখা যায়। কারণ, সংস্কৃত

সম্ভূত কার্যমাত্রই পরিবর্তনশীল, তথা উত্থান হতে পতন পর্যন্ত স্বাভাবিক। বহুবিধ হেতু ও প্রত্যয় (কারণ) সহযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে। ফলে মারা যায়। আবার পরিণাম-জন্ম হতে মৃত্যুর মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে জরা, ব্যাধিগ্রস্থ হয়। নির্বাণ কারণ সম্ভূত নয়। সেজন্য এর উৎপত্তি নেই। অনুৎপন্ন পদার্থের বিনাশ কোথায়? সুতরাং নির্বাণ অপরিণামশীল ও অবিনশ্বর।[৩৬] বুদ্ধ সংযুত্ত নিকায়ের অসংস্কৃত সূত্রে[৩৭] ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে একই উপদেশ দিয়েছেন। নির্বাণ জীবন্মুক্তের মৃত্যুর পর আর তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়না।

বিঞ্ঞানস্‌স নিরোধেন তন্‌হাক্‌খয় বিমুত্তিনো,

পজ্জো তস্‌সেব নিব্বানং বিমোক্‌খে হোতি চেতসো।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্কন্ধ নির্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয়-বিমুক্ত জীবন্মুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সাথে চিত্তের বিমোক্ষ হয়। অনাদি সংসার প্রবাহের অবসান এখানেই হয়।

wbev‡Yi ¯^iƒc

রাজা মিলিন্দ ভিক্ষু নাগসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে, নির্বাণ, নির্বাণ বলে যা বলছেন, সে নির্বাণের স্বরূপ[৩৮] আকার, বয়স-প্রমাণ, যুক্তি, উপমা, হেতু ও প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় কি? 'মহারাজ, নির্বাণ অসদৃশ; নির্বাণের স্বরূপ বয়স ও পরিমান-উপমা, যুক্তি, প্রণালী দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না।" ভন্তে, বিদ্যমান নির্বাণের যে রূপ, আকার, বয়স ও পরিমান না থাকলে তা হলে আমি নির্বাণ আছে বিশ্বাস করিনা। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

মহারাজা, মহাসমুদ্র আছে কি? 'হাঁ, ভন্তে, আছে।' 'মহারাজ, যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে, মহাসমুদ্রে জল কি পরিমাণ? কত জীব বাস করে? ভন্তে, তখন আমি তাকে উত্তর দিব, অবাস্তব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন? লোকতত্ত্ববাদীরাও এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, সম্ভবও নয়। আমি এরূপ প্রত্যুত্তর দেব।' মহারাজ! যেমন বিদ্যমান বস্তু মহাসমুদ্রে জলের পরিমান, কত জীব আছে, যেমন পরিমান করা সম্ভব নয়, তদ্রূপ নির্বাণের স্বরূপ, আকার, বয়স কিংবা পরিমান যুক্তি দিয়ে প্রদর্শন করা যাবেনা। কিন্তু নির্বাণের গুণ আছে কিনা? 'মহারাজ, প্রকৃত পক্ষে নেই অথচ গুণ হিসেবে একাংশ উপমা দিতে পারি।' ভন্তে, বলুন, আমি যেন আমার হৃদয়ের প্রদাহ নিবারণ করতে পারি।'

"মহারাজ! পদ্মের এক গুণ, জলের দুই গুণ, ঔষধের তিন গুণ, মহাসমুদ্রের চার গুণ, ভোজনের পাঁচ গুণ, আকাশের দশ গুণ, মনিরত্নের তিন গুণ, রক্ত চন্দনের তিন গুণ, সর্পিমন্ডের তিন গুণ, গিরিশেখরের পাঁচ গুণ, নির্বাণে অনু-প্রবিষ্ট আছে।" "ভন্তে, গুণগুলো বলুন।" মহারাজ! বলছিঃ মহারাজ, প্রথম গুণ জল যেমন শীতল, দাহশান্তিকারক, সেরূপ নির্বাণ শীতল এবং সর্ববিধ ক্লেশদাহ উপসম করে। জলের দ্বিতীয় গুণ ক্লান্ত, তৃষিত, পিপাসিত, ঘর্মাক্ত মানুষ ও পশু-পাখিকে পিপসা নিবারণ করে, তদ্রূপ ঔষধের এ প্রথম গুণ নির্বাণে অনুপ্রবিষ্ট। ঔষধের দ্বিতীয় গুণ যেন রোগসমূহের অন্তকারক, সেরূপ নির্বাণ সর্বদুঃখের অন্তকারক। ঔষধের তৃতীয় গুণ যেমন রোগমুক্তির জন্য অমৃত সদৃশ, সেরূপ নির্বাণ অমৃত স্বরূপ।

মহাসমুদ্রের প্রথম গুণ যেমন সকল প্রকার পচা (শব) শূন্য, তদ্রূপ নির্বাণ সর্বাধিক কলুষশূন্য। মহাসমুদ্রের দ্বিতীয় গুণ যেমন এপার ওপার সীমাহীন সেরূপ নির্বাণ– মহৎ ও সীমাহীন। মহাসমুদ্রের দ্বিতীয়গুণ যেমন বড় বড় প্রাণিদের আবাসস্থল, সেরূপ নির্বাণ অর্হৎ, ক্ষীণাশ্রব, বিমল, বলপ্রাপ্ত, বশীভূত মহাসত্ত্বদের আবাসস্থল। মহাসমুদ্রের তৃতীয় গুণ হচ্ছে অপরিমিত বিবিধ বীচা কুসুম কুসুমিত, সেরূপ নির্বাণ অপরিমিত বিবিধ বিপুল বিদ্যা ও বিমুক্তি কুসুমিত।

মহারাজ, ভোজনের প্রথম গুণ যেমন সকল প্রাণীর জীবনরক্ষক, আয়ুবর্ধক, তদ্রূপ সাক্ষাৎকৃত নির্বাণ সাধকের জরা-মরণ-নাশের দরুন আয়ুবর্ধক। ভোজনের দ্বিতীয় গুণ জীবের সৌন্দর্যবর্ধক, সেরূপ নির্বাণ সকল জীবের গুণ, সৌন্দর্যবর্ধক। ভোজনের তৃতীয় গুণ সকল প্রাণীর ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করে, সেরূপ নির্বাণ সকল প্রাণীর ক্লেশ-যন্ত্রনার উপশম করে। ভোজনের চতুর্থ গুণ ক্ষুধা, দুর্বলতা বিনোদন করে, সেরূপ নির্বাণ সকল প্রাণীর দুঃখরূপ ক্ষুধার দুর্বলতা অপনোদন করে। মহারাজ, আকাশ জন্মে না, জীর্ণ হয়না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ লুণ্ঠন করতে পারে না, কেউ চুরি করতে পারে না; অনাশ্রিত অবাধ, বিহগ গমনের অনুকূল আবরণহীন ও অনন্ত। সেরূপ নির্বাণ জন্মে না, জীর্ণ হয় না, মরে না, চ্যুত হয় না, উৎপন্ন হয় না, কেউ লুণ্ঠন করতে পারে না, চোর হরণ করতে পারে না, অনাশ্রিত, আর্যদের গমনযোগ্য নিরাবরণ ও অনন্ত।

'মহারাজ, মনিরত্নের ত্রিবিধ গুণ[৩৯] কাম্যবস্তু দান করে, আনন্দবর্ধক, জ্যোতি বিকিরণ করে, সেরূপ নির্বাণ কাম্যবস্তু দান করে, আনন্দদায়ক এবং জ্যোতি প্রকাশ করে।

‘মহারাজ, রক্তচন্দনের তিনগুণ-দুর্লভ, অসম সুগন্ধ-সজ্জন প্রশংসিত, সেরূপ নির্বাণও দুর্লভ, অসম সুগন্ধ, আর্য-প্রশংসিত।

‘মহারাজ, সর্পিমন্ডের তিনগুণ-বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন; তদ্রূপ নির্বাণের গুণ বর্ণসম্পন্ন শীলগন্ধসম্পন্ন ও রসসম্পন্ন।

‘মহারাজ, গিরিশেখরের পাঁচ গুণ[৪০]-অতি ঊর্ধ্ব, অচল, সর্ববিধ বীজের অনুৎপত্তিস্থান, শিখর দূরারোহ, অনুরাগ বিরাগমুক্ত; সেরূপ নির্বাণ অতি উচ্চ, অচল, দূরারোহ ও সর্ববিধ ক্লেশের অনুৎপত্তিস্থান।

পরিশেষে রাজা বললেন, সাধু ভন্তে, আপনার ভাষিত নির্বাণের গুণসমূহ স্বীকার করছি।

নির্বাণ পরম শান্তি, নির্বাণ শান্তির লক্ষণ; দুঃখের উপশম এর প্রতীতি। অচ্যুতি এর রস বা কৃত্য। অতীত জন্মের তৃষ্ণা ও অবিদ্যা ধ্বংস করে বর্তমান পঞ্চস্কন্ধ বা নামরূপের চির অবসানই নির্বাণ।

নির্বাণ অপরিনামশীল, অবিনশ্বর ও কালাতীত। সুতরাং ইহা ধ্রুব; অসংস্কৃত বলেই ইহা শুভ। নির্বাণ পরম সুখ, দুঃখ মিশ্রিত নয়।[৪১]

নির্বাণ শ্রেষ্ঠ এবং অনুত্তর যোগক্ষেম। দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু মানুষের কল্পনা-সম্ভব তার মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। নির্বাণ এমন অমৃতপদ যা পরম শান্তিপদ এবং সুখকর। এতে অদুঃখ, অসুখ, অজর, অমর, অব্যাধি বর্জিত চিত্তের এমন এক অনির্বচনীয় অবস্থা যা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান- এ পাঁচ প্রকার চিত্তের আলম্বন ত্যাগ করতে পারলেই নির্বাণ অনুভূত হয়। নির্বাণ প্রাপ্ত বিমুক্ত পুরুষ শমথ ও বিদর্শন ধ্যানে মগ্ন হয়ে সংশয়মুক্ত ও অনাসক্ত হয়ে বিহার করেন।

নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স, পঞ্ঞা নত্থি অঝায়তো,
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞা চ সবে নিব্বান সন্তিকে।[৪২]

evsjv Abev‘

যে প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞাবান) নয় তার ধ্যান হয় না। ধ্যানহীন ব্যক্তির প্রজ্ঞা হয় না। যে ব্যক্তির ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই আছে তিনি নির্বাণের সমীপবর্তী।

সুতরাং নির্বাণ লাভ করতে হলে শীলবান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রথমে সাধনা দ্বারা রাগ-দ্বেষ-মোহ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিকে জয় করতে হবে। এভাবে তিনি নিরুপদ্রব, নির্ভয়, নিস্পৃহ ও কল্যাণকামী হয়ে নির্বাণ কি তা উপলব্ধি করবেন। নির্বাণ সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তা লাভের উপায়ও নির্ণয় করা সম্ভব। বুদ্ধশাসনে স্থিত ব্যক্তি চতুরার্য সত্যের সম্যক উপলব্ধি এবং আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের যথার্থ অনুশীলনের দ্বারা নির্বাণ লাভের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হন। অবশ্য এর জন্য জন্ম-জন্মান্তরের কুশল কর্মের প্রভাবও থাকা চাই। সুকর্মের সুফল দ্বারা নির্বাণ লাভ ত্বরান্বিত হয়, অন্যদিকে কুকর্মের কুফল হেতু নির্বাণ সাক্ষাৎ তো দূরের কথা, বরং নানা অশুভ যোনীতে জন্ম নিয়ে ভোগ করতে হয় অশেষ দুঃখ-ক্লেশ।

দেব-মনুষ্যের অন্তহীন সাধনায় নির্বাণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাম্য। নির্বাণ লাভের জন্য তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরলস সাধনায় রত হন। এই সাধনাই তাঁকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যায় নির্বাণ-মার্গের দিকে। সুতরাং তথাগত বুদ্ধ- প্রদর্শিত পথ যথাযথ অনুসরণ করে নির্বাণ লাভের প্রচেষ্টায় থাকাই বিধেয়।

wbevY mv ÿ vrKvi

ভন্তে, নাগসেন! আপনারা বলেন "নির্বাণ, অতীত নয়, ভবিষ্যত নয়, বর্তমান নয়, উৎপন্ন নয়, অনুৎপন্ন নয় এবং উৎপাদনীয় নয়।" ভন্তে! জগতে উত্তমরূপে সুনিয়োজিত যে - কোন লোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন (নির্বাণ) সাক্ষাৎ করে, অথবা উৎপাদনের মাধ্যমে কী সাক্ষাৎ করে?"

'মহারাজ, উত্তমরূপে নিয়োজিত যে কোন লোক নির্বাণ সাক্ষাৎ করে, সে উৎপন্ন সাক্ষাৎ করে না, উৎপাদন করে সাক্ষাৎ করে না, অথচ মহারাজ। এই নির্বাণ- ধাতু আছে যাকে সে উত্তমরূপে নিয়োজিত হয়ে সাক্ষাৎ করে।"[৪৩]

"ভন্তে! প্রশ্ন প্রতিচ্ছন্ন করে উত্তর দেবেন না। উন্মুক্ত ও প্রকটিত করে প্রকাশ করুন। আমার জানার ইচ্ছা ও উৎসাহ জাগ্রত হয়েছে। আপনি যা শিক্ষা করেছেন তা এখানেই সম্পূর্ণ আকীর্ণ করুন। এ বিষয়ে জনগণ মোহাচ্ছন্ন, বিমতিগ্রস্থ ও সংশয়াপন্ন রয়েছে। এটা বিদীর্ণ করুন। দ্বেষ শল্যের অবসান হোক।

"মহারাজ! সে শান্ত, সুখময় ও উত্তম নির্বাণধাতু আছে। যেমন তা সম্যক নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞাদ্বারা শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করে, সেরূপ সম্যক নিয়োজিত যোগী বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে প্রজ্ঞাদ্বারা নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন।

সে নির্বাণকে কি প্রকার দেখা উচিত? নির্বিঘ্ন, নিরূপদ্রব, নির্ভয়, অক্লেশ, শান্ত, সুখ, স্বাদ, উত্তম, শুচি ও শীতল হিসেবে দেখা উচিত।

লোভাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি- এ ত্রিবিধ দাবদাহের পরিসমাপ্তিই নির্বাণ অর্থাৎ পরম শান্তি।

পঞ্চোপাদান স্কন্ধই দুঃখ; সুতরাং দুঃখের নিরোধ আছে। দুঃখ এবং আমি পরস্পর অদ্বয়; যেন অর্চ্চি আভা। সেজন্য বলা হয়েছে:

কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি এতং সম্মাদস্সনং।

বনের অগ্নি নির্বাপণে, বন তো আর বন থাকে না; উভয়েরই শান্তি হয়। অগ্নি এবং বন একোৎপাদ, এক নিরোধ, পরস্পর অদ্বয়। বন ব্যাপ্যার্থ অর্থাৎ বহুবৃক্ষে ব্যাপ্ত ভূখণ্ড।

নির্বাণ চিত্তের এমন এক অবস্থা যা সর্বোপরি বিবর্জিত ও সর্ব সংস্কার বিমুক্ত। রোগ, শোক, ভয়, ভীতি প্রভৃতি সংসারের কোন প্রকার মালিন্য ওকে স্পর্শ করতে পারে না। পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত দেহ ধারণ করা অতিশয় দুঃখজনক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা এমন এক প্রকার দুঃখ যা হতে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। আজীবন ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় মানুষ অস্থির। ক্ষুধা, তৃষ্ণা মানুষের নিত্য রোগ সদৃশ। এরূপ ক্ষুধা তৃষ্ণা হতে ত্রাণ পাওয়া সত্যিই পরম সুখ নয় কি? নির্বাণ অতুলনীয়। এর অস্তিত্ব রূপ, সংস্থান, বয়স প্রমাণ, উপমা, হেতু বা মুক্তির দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত, প্রণীত ও সুখদায়ক।

UxKv I Z_¨wb‡'k

১. জ্ঞানানন্দ স্থবির, সদ্ধর্ম সোপান, চট্টগ্রাম, ১৯৯১ইং, পৃ: ৭১

২. ন তেন অরিয়ো হোতি যেন পাণানি হিংসতি,

অহিংসা সব্বপাণানং অরিয়ো'তি পবুচ্চতি।

(ধম্মপদ, ধম্মট্ঠ বগ্গো, গাথা নং-১৫)

৩. মহাসতিপট্ঠান সুত্ত, - দীর্ঘনিকায়, ২/৯

৪. ধম্মপদ, লোকবগ্গো, গাথা নং-১

৫. মজ্ঝিম নিকায়, ১/২/৩

৬. যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্হে ছিন্নেপি রক্খো পুনদেব রুহতি,

এবং তণ্হাসয়ে অনুহতে উপ্পজ্জতি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।

৭. ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রানী বড়ুয়া, বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব, ঢাকা, ২০১০, পৃ: ১০১

৮. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, মিলিন্দ প্রশ্ন, কলিকাতা, ১৯৭৭ইং, পৃ: ৩৭

৯. ঐ, পৃ: ৩৮

১০. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলিকাতা, ১৯৭৪ইং, পৃ: ৮২

১১. বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫ইং, পৃ: ২৩

১২. প্রজ্ঞালোক স্থবির, অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৫২, পৃ: ৫

১৩. বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৫

১৪. ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা, ২০০৮), পৃ: ৫৫

১৫. বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ: ৫২-৫৩

১৬. প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু, সদ্ধর্ম-সহচর (নালন্দা বিদ্যাভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ: ৪৭

১৭. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (কলিকাতা, ১৯৭৪), পৃ: ৮২

১৮. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা, ১৯৭৭), পৃ: ৩৭

১৯. ঐ, পৃ: ৩৯

২০. ঐ, পৃ: ৩৯

২১. শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু সম্পাদিত ও অনূদিত উদানং (রেঙ্গুন, ১৯৩০), বোধিসুত্তং, পৃ: ২

২২. শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি সংকলিত প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি বা কার্য-কারণ নীতি (চট্টগ্রাম, ১৯৩৯), পৃ:১

২৩. উদানং, পূর্বোক্ত, পৃ:৩

২৪. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন, ৩য় সংস্করণ (কলিকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ), পৃ: ৩১

২৫. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত মিলিন্দ প্রশ্ন (কলিকাতা, ১৯৭৭),পৃ: ৬৪

২৬. ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (কলিকাতা, ২০০৮), পৃ: ১১৩

২৭. ড. সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৯

২৮. ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র বড়ুয়া প্রণীত অভিধম্মার্থ সংগ্রহ, চট্টগ্রাম, ১৯১১, পৃ: ২৬৪

২৯. শান্তরক্ষিত মহাস্থাবির সংকলিত পালি - বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ২০০১) পৃ: ১১০

৩০. ঐ, পৃ: ১৪১

৩১. ধম্মপদ, মগ্গ বগ্গো-গাথা-৫

৩২. ফন্দনং চপলং চিত্তং দুরক্খং দুন্নিবারয়ং,
উজুং করোতি মেধাবী উসুকারো'ব তেজনং।
(ধম্মপদ, চিত্ত বগ্গো, গাথা-১)

৩৩. ধম্মপদ, সুখ বগ্গো, গাথা নং-৮

৩৪. শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু অনূদিত সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ খণ্ড (চট্টগ্রাম, ২০০৯), পৃ: ২৩৮-২৫২

৩৫. ঐ, পৃ: ১৩৮

৩৬. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৭-১৩৮

৩৭. শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, সংযুক্ত নিকায়, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৮-৩৩৮

৩৮. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত মিলিন্দ প্রশ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৯-৩১৪

৩৯. ঐ, পৃ: ৩১২-৩১৩

৪০. ঐ, পৃ: ৩১৪

৪১. ঐ, পৃ: ৩০৬

৪২. ধম্মপদ, ভিক্খু বগ্গো, গাথা নং-১৩

৪৩. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত মিলিন্দ প্রশ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

Dcmsnvi

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির পটভূমি সূচিত হয়। ঐতিহাসিক Oldenbarg উল্লেখ করেন– "For hundred of years before Buddha's time, movements were in progress in Indian thought which prepared the way for Buddhism".

পৃথিবীতে যখন মানবজাতির ক্রান্তিকাল চলছে, মানবতা যখন ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, মনুষ্যত্ব ছেড়ে মানুষ অধর্ম ও অসত্যের পথে চালিত হচ্ছে, তখন মানবজাতিকে দুঃখ থেকে মুক্তি এবং সৎপথে পরিচালিত করতে জ্যোতির্ময় বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তর পারমীসমূহ পূর্ণ করে মানবের দুঃখমুক্তির জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

"নাশিয়া ধরার অজ্ঞান আঁধার নৈরঞ্জনার কূলে
প্রজ্ঞার জ্যোতি উঠেছিল ভাতি অশ্বত্থ, তোমার মূলে।
সেইদিন হতে এই ধরণীতে ধন্য হয়েছো তুমি
ত্রিভববাসীরা হতেছে ধন্য তোমার চরণ চুমি।"[১]

সিদ্ধার্থ গৌতম খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ (মতান্তরে ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্ব) অব্দে নেপালের অন্তর্গত শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়ার ঔরসে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কুমার সিদ্ধার্থ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, "জন্ম-জন্মান্তর বহু দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে অসংখ্য পুণ্য পারমী পূরণ করে আমি এ জগতে দুর্লভ মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করেছি। বহু জন্ম পরিগ্রহ করে আমি গৃহকারকের সন্ধান লাভ করেছি। এ জীবন মুক্ত, শাশ্বত ও নির্বাণ প্রদায়ী।" পবিত্র পূর্ণিমা তিথিতে পরম কাঙ্খিত রাজপুত্রের আবির্ভাবে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাঁর মাতা মায়াদেবী মৃত্যুবরণ করেন। রাজকুমারের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন– তাঁর মাসী, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। গৌতমী কর্তৃক প্রতিপালিত বলে তাঁর আর এক নাম গৌতম।

Dhaka University Institutional Repository

'বোধি' শব্দ থেকে বুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। 'বোধি' অর্থ 'জ্ঞান' আর 'বুদ্ধ' অর্থ 'জ্ঞানী'। অর্থাৎ যাঁর মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের পরিপূর্ণতা রয়েছে তাঁকে বুদ্ধ বলে। বোধিজ্ঞান অসাধারণ। যিনি লোভ-দ্বেষ-মোহ চিরতরে ক্ষয় সাধন করতে পারেন তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। মহাকারুণিক বুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ হয়েছিল। সম্যক সম্বোধিজ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা জ্ঞান হল অনুপম ও অতুলনীয় বিমুক্তি জ্ঞান অথবা নৈর্বাণিক জ্ঞানসহ সকল প্রকার জ্ঞান। এর অপর নাম হল বোধিজ্ঞান। বোধিজ্ঞান হল স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ-এই চার মার্গ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ। সম্বোধিজ্ঞান লাভ ছিল তথাগত বুদ্ধের পরম প্রাপ্তি। আর এই সম্বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।

যথাসময়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ নানাবিধ বিষয়ে বিদ্যা শিক্ষা আয়ত্ত করেন। পন্ডিত বিশ্বমিত্র ছিলেন কুমারের শিক্ষা গুরু। কুমার সিদ্ধার্থ দিন দিন সংসারের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখে অনীহাভাব পোষণ করেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র সিদ্ধার্থকে সংসারী করার জন্য ষোড়শ বর্ষে দন্ডপাণির কন্যা যশোধরার (গোপা) সাথে তাঁর বিয়ে দেন। তিনি পুত্রের জন্য সকল ভোগ বিলাস ও ঐশ্বর্যে উদাসীন ছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সর্বদা চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। একদিন দেবদত্তের তীরবিদ্ধ হংস পক্ষীর ব্যাথায় আরো ব্যথিত ও চিন্তিত হলেন। একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বের হয়ে ব্যাধিগ্রস্ত লোক, বৃদ্ধলোক, মৃত ব্যক্তি, সন্ন্যাসী এই চার নিমিত্ত দর্শন করে উপলব্ধি করলেন- জন্ম-মৃত্যু থেকে কেউ রক্ষা পাবেনা। জীব মাত্রই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া কোন মুক্তি নেই। রাজকুমার গৌতমের মনে বৈরাগ্য ভাব উৎপন্ন হল। ইতোমধ্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থের স্ত্রী গোপার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল, নাম রাখা হলো রাহুল। সিদ্ধার্থ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্রের মায়ার বন্ধন, রাজ-সিংহাসন ও ভোগ-ঐশ্বর্য ছেড়ে গৃহত্যাগের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। ঊনত্রিশ বছর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রিতে সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দক ও অশ্ব কণ্ঠককে নিয়ে অনোমা নদীর তীরে এসে রাজকীয় ভূষণ ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগের পর রাজকুমার গৌতম বৈশালীতে আরাড় কালাম, শ্রাবস্তীতে রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রমে ধ্যান সাধনা করেন। এরপর আরো উচ্চতর ধ্যান শিক্ষার জন্য উরুবিল্বের নির্জন অরণ্যে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যসহ রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর ধ্যান-তপস্যায় মগ্ন হন। সিদ্ধার্থ গৌতম উপলব্ধি করলেন কঠোর কৃচ্ছসাধনে সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। কঠোর তপস্যায় দেহ সুস্থ থাকেনা, চিত্তে ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি থাকেনা। তাই তিনি মধ্যম পথ[২] অবলম্বনের সংকল্প করলেন। একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করে বুদ্ধগয়ার নৈরঞ্জনা নদীতে এসে স্নান করে পায়সান্ন ভোজন করে বোধি লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে

গভীর ধ্যানে রত হয়ে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। মহাকারুণিক বুদ্ধ সর্বপ্রথম সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কাছে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র'[৩] দেশনা করেন। তিনি জাতিস্মর জ্ঞানের[৪] মূলধারা চার আর্যসত্য উদ্ভাবন করলেন। যথা-

১. দুঃখ

২. দুঃখ সমুদয়

৩. দুঃখ নিরোধ এবং

৪. দুঃখ নিরোধের উপায়

মহামতি বুদ্ধ তাঁর উদ্ভাবনে দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবনে নানাবিধ দুঃখ বিদ্যমান। জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু – এসকল দুঃখ সব মানুষের জীবনে আছে– এ কথা ধ্রুব সত্য। কোন মানুষই তার জীবনে দুঃখ চায়না, চায় আনন্দ, একটু স্বস্তি কিংবা অনাবিল শান্তি। আর সে চাওয়া ও পাওয়ার হেতু থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। মহামানব বুদ্ধের প্রচারিত ও আবিষ্কৃত ধর্মকে অনেকে দুঃখবাদী (Pessimism) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম কি সত্যিই দুঃখবাদী ধর্ম? বুদ্ধের সত্যানুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য বিষয় চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আলোচনা করলে এতে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। আমার মতে, বৌদ্ধ ধর্ম একটি সাম্যবাদী জীবনমুখী মানবধর্ম। এখানে আলোচনা করা হয়েছে জীবনে দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে। দুঃখের উৎপত্তি যেমন আছে, দুঃখের নিবৃত্তির উপায়ও তেমন আছে। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য হলো মানুষের জীবন-দুঃখ থেকে নিবৃত্তি। তাই মহাকারুণিক বুদ্ধ মানুষকে মুক্তি লাভের জন্য আত্মপ্রচেষ্টার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। জগৎ হতে জগতে জীবন যেমন চ্যুত ও উৎপন্ন হয়, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছেন মহাকারুণিক ত্রিলোক শাস্তা ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সাধনার মূলে রয়েছে দেব-মানবের হিত-সাধন। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের সত্যানুসন্ধানের নিরীক্ষিত সত্য হলো জগত দুঃখময়। এটা শুধু দারিদ্র্যের বা অভাব অনটনের দুঃখ নয়। জরা, ব্যাধিও দুঃখ নয়। এটা হলো সম্পূর্ণ অস্তিত্বই দুঃখময়। পঞ্চস্কন্ধ সমবায়ে গঠিত মানুষ এবং এই স্কন্ধগুলোকে দুঃখ বলা হয়েছে। কিন্তু স্কন্ধগুলো দুঃখ নয়, বরং দুঃখের বাহন মাত্র। আর জীবনের সাথে এই দুঃখের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। দুঃখের এ সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ খুঁজতে গিয়েই বুদ্ধের অন্যতম সত্যানুসন্ধান হল চার আর্যসত্য। তথ্যের দিক থেকে বিচার করা হলে- চার আর্যসত্য হচ্ছে বুদ্ধের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনের সারকথা। আবার দুঃখ মুক্তিমার্গের অনুশীলনের দিক থেকে বিচার করলে চার আর্যসত্য হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের শেষ কথা। মহাকারুণিক

বুদ্ধের সত্য উপলব্ধির মূল বা সারকথা হচ্ছে কার্যকারণ নীতি বা শৃঙ্খলা। দুঃখই হল প্রথম আর্যসত্য। কারণ, জীবগতে দুঃখ অপেক্ষা বড় কোন সত্য নেই। এ দুঃখের কারণ বা হেতু আছে। হেতু ব্যতীত কোন কিছুর উৎপত্তি সম্ভব নয়। দুঃখের হেতু বা কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য। এই হেতু বা কারণজাত দুঃখের নিবৃত্তি আছে– এটা তৃতীয় আর্যসত্য। দুঃখনিবৃত্তির উপায়- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন। এটা হচ্ছে চতুর্থ আর্যসত্য।

প্রত্যেকের মধ্যেই সম্যক প্রজ্ঞা প্রযুক্ত থাকে। প্রজ্ঞা জাগ্রত হলে আমরা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানতে পারি। যতদিন তা না হয় ততদিন আমরা অসত্যকে সত্য এবং অসারকে সার বলে মনে করি। আমরা ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য ধাবিত হই। আমরা এটা অনুধাবন করি না যে, দীর্ঘদিন কিছুই ভোগ করা যায় না। সমস্ত কিছুই অনিত্য, মায়া এবং মরীচিকা তুল্য। আমাদের চক্ষু মনোরম বস্তুর দিকে ধাবিত হয়। আমাদের জিতেন্দ্রিয় আস্বাদনীয় বস্তুর প্রতি লালায়িত হয়। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধের দিকে ধাবিত হয়। আমাদের কায়েন্দ্রিয় সুখস্পর্শের জন্য কাতর হয়। আমাদের মনেন্দ্রিয় সুখকর চিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়। কিন্তু এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নিয়ত পরিবর্তনশীল। ইহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী বিপরিণামধর্মী বস্তুকে আঁকড়িয়ে ধরতে চাওয়াই হল মূর্খতা। অবিদ্যা প্রসূত তৃষ্ণা আমাদের এরূপ করতে বাধ্য করে। এর কারণ হল তৃষ্ণা। তৃষ্ণাই আমাদের বিভ্রান্ত করে। তৃষ্ণা আমাদের বিপথে পরিচালিত করে এবং তৃষ্ণাগ্নি প্রতিনিয়ত আমাদের দগ্ধ করছে। তৃষ্ণার অনলে ব্যক্তি স্বয়ং যে দগ্ধ হয় তা নয়, অন্যদেরও দগ্ধ করে। সমূলে তৃষ্ণাকে উৎপাটিত করতে হবে। তৃষ্ণাই সর্বদুঃখের মূল। মানুষের সকল প্রকার দুঃখের কারণ হল তার নিজের কর্ম এবং সকল কর্মের মূলে তার তৃষ্ণা। তৃষ্ণোৎপত্তির কারণরূপে অবিদ্যা হল উল্লেখযোগ্য বিষয়। অবিদ্যা থেকেই যে তৃষ্ণার উৎপত্তি তা বুদ্ধের সত্যানুসন্ধানের অন্যতম আবিষ্কার প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ শৃঙ্খলার মধ্যে আলোচিত হয়েছে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির আলোকে বলা যায়, মানব জীবনে দুঃখের কারণ হলো জন্ম (জাতি)। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করলে মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হতো না। জন্মের কারণ আছে এবং তা হলো জন্ম লাভের বাসনা বা ভব। জাগতিক বস্তুর প্রতি মোহ বা আসক্তি (উপাদান) থেকে জন্ম লাভের বাসনা হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ভোগস্পৃহাই (তৃষ্ণা) এ আসক্তির কারণ। এ তৃষ্ণা আবার জাগ্রত হতো না যদি আমাদের ভোগ করার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা (বেদনা) না থাকতো। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বিষয়বস্তু ভোগ করি ও তৃপ্তি পাই এবং ভোগের এই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়সমূহের প্রতি আমাদের ভোগস্পৃহা বা তৃষ্ণা জন্মে। এই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা বেদনার কারণ হলো স্পর্শ। বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শের কারণেই ইন্দ্রিয়

অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়। স্পর্শ আবার সম্ভব হতো না যদি আমাদের ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় (ষড়ায়তন) না থাকতো। ষড়ায়তনের অস্তিত্ব আবার নির্ভর করে দেহ ও মনের গঠনের উপর। সুতরাং ষড়ায়তনের কারণ হলো দেহ-মনের সংগঠন- নামরূপের উপর। নাম-রূপ যদি চেতনাময় না হতো, তাহলে ষড়ায়তনের কারণ হতে পারতো না। নাম-রূপের কারণ হলো চেতনা (বিজ্ঞান)। অন্যদিকে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণে যে চেতনা উৎপন্ন হয় - তা হলো পূর্বজীবনের কৃতকর্মের ছাপ (সংস্কার) সংস্কারই হল চেতনার কারণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞতার কারণেই সংস্কারের উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা বলতে বুঝানো হয়েছে সত্য বা জগতের বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা। অজ্ঞতার কারণেই মানুষ জাগতিক বস্তুকে স্থায়ী মনে করে এবং এর প্রতি আসক্ত হয়। অবিদ্যা বা অজ্ঞতা থেকে জন্ম পর্যন্ত বারটি কার্যকারণ শৃঙ্খলায় মানুষের জীবন আবদ্ধ আছে বলে একে দ্বাদশ নিদান বলা হয়েছে। এই দ্বাদশ নিদানের ফলেই মানুষ জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, পুনর্জন্ম প্রভৃতির মাধ্যমে এ সংসার চক্রে আবর্তিত হচ্ছে- বার বার জন্মগ্রহণ করছে। সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ পৃথিবীতে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। এটি মানুষের কৃতকর্মের ফল। দুঃখের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে চেতনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সংস্কার। সংস্কার হলো পূর্বজন্মের কর্মফল। জগতে যেহেতু সবকিছুই শর্তাধীন, তাই মানুষের অস্তিত্বও শর্তাধীন অর্থাৎ কারণের উপর নির্ভরশীল। জগতের প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার যেহেতু কারণ আছে, সুতরাং আমাদের জীবনেরও কারণ আছে। মানুষের বর্তমান জীবনের কারণ হলো তার অতীত জীবনের কৃতকর্ম এবং বর্তমানের পরিণতি হলো ভবিষ্যত জন্ম। মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে এবং কর্মফল অনুযায়ী বার বার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে বাসনাহীন, আসক্তিহীন ও মোহমুক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্বাণপ্রাপ্ত হলে তাকে আর কর্মফলাধীন হতে হবে না।

এই সংসার জীবনে যে সুখ দৃষ্ট হয়, তা হেমন্তের প্রভাতে ঘাসের উপর এক ফোঁটা শিশির বিন্দু মুক্তার মতো ঝল্‌মল্ করে, আর রোদ তীব্র হলে শুকিয়ে যায়, ঠিক তদ্রূপ আমাদের জীবনে যে সুখ বলে দৃষ্ট হয় তা তৃণোপরি শিশির বিন্দুর মতো অতি ক্ষণস্থায়ী। আর দুঃখের পরিমাণ সাগরের জলরাশি সদৃশ বিপুল। এই দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য মহাকারুণিক বুদ্ধের আবিষ্কৃত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে গ্রহণ করে মানব জীবনকে নৈতিকতার আদর্শে রূপায়িত করতে হবে। সম্পত্তি ছাড়া কেউ সুখ ভোগ করতে পারে না। মনুষ্যগণ মনুষ্য সম্পত্তি, দেবগণ দেব সম্পত্তি এবং ব্রহ্মগণের ব্রহ্ম সম্পত্তি প্রয়োজন। তবে সকল সম্পত্তির ঊর্দ্ধে হল নির্বাণ সম্পত্তি। এই নির্বাণ সম্পত্তি অর্জনের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনা করতে

হবে। এটা দুঃখ-মুক্তির একমাত্র উপায়। এই মার্গ অনুসরণ করে মানুষ সব দুঃখের অন্তসাধন করে পরম সুখকর নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে সক্ষম। নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে একমাত্র মধ্যপথই সব সাধকের জন্য উপযোগী। এটি সকলের সাধ্যানুরূপ, সহনীয় ও মহা-উপকারী পথ। একমাত্র এই মধ্যপথই সাধককে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধি ও পরম মুক্তির দিকে এগিয়ে নিতে সক্ষম। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে জীবন গঠনই হচ্ছে প্রকৃত মধ্যপথ অনুসরণ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিনটি প্রধান স্তর হল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা। এই মার্গের আটটি স্তর নিম্নরূপ:

ক. প্রজ্ঞা (Wisdom)
- (১) সম্যক দৃষ্টি (Right Understanding)
- (২) সম্যক সংকল্প (Right Thought)

খ. শীল (Morality)
- (৩) সম্যক বাক্য (Right Speech)
- (৪) সম্যক কর্ম (Right Action)
- (৫) সম্যক জীবিকা (Right Livelihood)

গ. সমাধি (Concentration)
- (৬) সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম (Right effort)
- (৭) সম্যক স্মৃতি (Right Mindfulness)
- (৮) সম্যক সমাধি (Right Concentration)

যে ব্যক্তি অষ্ট অঙ্গের সবকয়টি নীতি অভ্যাসে অভ্যস্ত তিনিই কেবল নির্বাণের সন্ধান পেতে পারেন। প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে যার চরিত্র গঠিত সেই ব্যক্তির সত্তা সমাধিস্থ হয়ে জগৎ রহস্য উদঘাটন করতে পারে, আর তখনই সেই ব্যক্তি জগৎ মায়ার জাল ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম।

একজন একনিষ্ঠ নির্বাণকামীর জন্য সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে- তাঁর আলোকবর্তিকা, সম্যক সংকল্প-তাঁর পথ প্রদর্শক, সম্যক বাক্য- তাঁর পথ মধ্যস্থিত প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, সম্যক কর্ম- তাঁর বিমল আনন্দ, সম্যক জীবিকা- তাঁর অবলম্বন, সম্যক ব্যায়াম – তাঁর পদক্ষেপ, সম্যক স্মৃতি – তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সম্যক সমাধি – তাঁর শান্তির আবহ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে রয়েছে শীলের সাধনা, সমাধির ভাবনা ও প্রজ্ঞার অনুশীলন। কায়িক ও বাচনিক পাপকর্ম ত্যাগ করে শুদ্ধাচারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চরিত্র শোধনের নাম শীল সাধনা। এই সাধনা মনকে সহজ, সুন্দর ও পবিত্র করে তুলে। এরূপ মন নিয়ে যখন শীলবান, সুচরিত্র সাধক ধ্যানমগ্ন হন, তখন তিনি ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সমাধি বা অন্তর উৎকর্ষের পূর্ণতা লাভ করেন। এ অবস্থায় মনে প্রজ্ঞার আলো ছড়িয়ে পড়ে। তার শুভ্র আলোয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আসে। তখন মনের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। যিনি এভাবে সাধনা করে বন্ধনহীন শুদ্ধ মুক্ত হন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর সীমা ছাড়িয়ে সকল দুঃখের অবসান করতে পারেন এবং নির্বাণগামী হতে পারেন।

মহাকারুণিক বুদ্ধের কঠোর ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে অর্জিত সত্যানুসন্ধানকে মানবজীবনে আয়ত্ত করতে হলে আত্মশক্তি ও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। মহাকারুণিক বুদ্ধ যে দুঃখমুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন, তা কোন আচার্য-উপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নয় অথবা কোন অলৌকিক শক্তিও নয়। তিনি মধ্যপথ অনুসরণ করে একমাত্র আত্মশক্তির সাহায্যে এই নৈর্বাণিক ধর্ম বা অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন। মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ সর্বদা আত্মশক্তির জয়গান করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, "অত্তদীপা বিহরথ, অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা।" অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা নিজেরাই নিজেদের দীপ হয়ে বিচরণ কর, নিজেই নিজের শরণ গ্রহণ কর। আত্মশরণই শ্রেষ্ঠ বা অনন্য শরণ।" আত্মশক্তির সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব প্রত্যেকের থাকা উচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মহাকারুণিক বুদ্ধের ধর্ম হল আত্মশক্তি বা আত্মপ্রত্যয়ের ধর্ম। এক্ষেত্রে কেউ কাউকে মুক্তি এনে দিতে পারে না। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুক্তি বা আত্মোন্নতি নিজেকেই অর্জন করতে হবে। অপরদিকে, আত্মশুদ্ধি হল বুদ্ধের অর্জনকৃত সত্য উপলব্ধিগুলো অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। আত্মশুদ্ধি হল মানবমুক্তির চাবিকাঠি। মানব জীবনের অপরিসীম দুঃখরাশি থেকে চিরমুক্তি অর্জনের জন্য আত্মশুদ্ধি হল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বীর্যবত্তার সাথে এগিয়ে যেতে হবে, নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে এবং ধাপে ধাপে স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে তাহলেই জয় অনিবার্য। আত্মশক্তির প্রভাবে মানুষ ইচ্ছা করলে দেবাতিদেব, ব্রহ্ম-মহাব্রহ্মা, নির্বাণ লাভী অর্হৎ, এমনকি অনন্ত জ্ঞানী বুদ্ধ পর্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা। নিজেকে অথবা নিজের ষড়ন্দ্রিয়কে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) সুসংযত করতে পারলে কিংবা পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ করতে পারলে ইহজীবনে নির্বাণ লাভ সম্ভব। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে, মানবতার মহামিলনে আমরা কতটুকু নিঃস্বার্থ হতে পেরেছি, সকলের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হতে পেরেছি, তাদেরকে কতটুকু ভালবাসতে পেরেছি, নিজেদের কতটুকু দীপ হিসেবে গঠন করতে পেরেছি? সর্বোপরি আমরা আমাদের কতটুকু জানতে পেরেছি? আমি মনে করি, আমাদের বাক্য মিথ্যা, আমাদের কর্ম মিথ্যা, আমাদের আচরণ মিথ্যা, আমাদের অভিজ্ঞতা মিথ্যা। আমরা আমাদের পিতা-মাতাগণকে ভক্তির ভাণ করি মাত্র, পুত্র-কন্যাকে স্নেহের ছলনা করি মাত্র এবং নিজেদেরকেও ক্রমাগত ছদ্মবেশে আবৃত করতে করতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে নিজেই নিজেদের চিনে উঠতে পারছিনা। আমাদের দেহ-মন কুলষিত, আমরা সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তায় রত। তাই আমাদের চিকিৎসাকল্পে ডাক্তার, কবিরাজ, ঝকা-বৈদ্য প্রমুখ জনের শরণ গ্রহণ করি। আর কলুষিত মনে ধর্ম-বারি ছিটানোর জন্য শরণ গ্রহণ করি সাধু-সন্ন্যাসী আর দরবেশের। কিন্তু এ অবস্থায় আমাদের কারো শরণ প্রয়োজন নেই, আত্মার (নিজের) শরণ গ্রহণ করা উচিৎ। আমাদের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি ইচ্ছা ও

কল্পনাকে আন্তরিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা উচিৎ যে তার মধ্যে সত্য, সারল্য ও সততা কতটুকু বিদ্যমান। নিজেদেরকে প্রদীপসম গড়ে তুলতে হবে, স্বীয় আলোতেই আত্ম-পর সমন্বয় করতে হবে, তাহলেই অর্জিত হবে সর্বদুঃখের অবসান বা অন্তসাধন, বিমুক্তি বা নির্বাণ।

মানুষের অজ্ঞতা ও অনাচারে যখনই পৃথিবীতে নেমে আসে নিকষকালো অন্ধকার, তখন প্রদীপের আলোর মত নিপতিত মানুষের মনে-প্রাণে গভীর প্রভাব ফেলল সিদ্ধার্থ তথা গৌতমের বাণী। আজ পৃথিবীর মানুষের কাছে যিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এমনি এক তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন মানবপুত্র গৌতম। মহামানব গৌতম বুদ্ধ বিশ্বজগতের এক সার্থক মানবসত্তা। ধ্যান-জ্ঞান-প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন জগৎ শ্রেষ্ঠ মহামানব। মানবপুত্র গৌতম অবতার হিসেবে ধরাধামে প্রেরিত হননি। তিনি নিজেকে কখনও ঈশ্বর হিসেবে দাবি করেননি। তিনি ছিলেন জগৎ সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম উৎসারিত একজন মানুষ। তিনি নিজেকে আত্মশক্তির বদৌলতে ধ্যান-সাধনা ও প্রজ্ঞায় মহীয়ান করেছেন। মহামানব গৌতম বুদ্ধ সকল প্রকার দোষ, কাম (রাগ), তৃষ্ণা ধ্বংস করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব। সমস্ত জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়। তিনি মানুষের মধ্যে একজন মহান মানুষ, একজন অসাধারণ মানুষ। তিনি পুরুষদের মধ্যে একজন মহান পুরুষ এবং অদ্বিতীয় হিসেবে বিবেচিত হন।

UxKv I Z_¨wb‡'k

১. গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, লালিম হক, প্রকাশ- ২০০১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. কামভোগ বা অফুরন্ত ভোগ-স্পৃহার তৃপ্তি সাধন এবং আত্মপীড়ন বা কঠোর কৃচ্ছসাধন এই দুই অন্ত বা চরম পথ প্রব্রজিতের (গৃহত্যাগী ভিক্ষুর) জন্য একান্তই পরিত্যজ্য। এই দুই অন্তের মাঝামাঝি অর্থাৎ পরিমিত আহার গ্রহণ করে ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে দুঃখ মুক্তি লাভ করাই হল মধ্যপথ বা মধ্যমপন্থা। বুদ্ধ বলেছেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে জীবন গঠনই হচ্ছে প্রকৃত মধ্যপথ অনুসরণ। এ মধ্যপথ অনুসরণ করে তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং অনুত্তর মহান সম্যক সম্বোধিপ্রাপ্ত হন। মধ্যপথই দুঃখমুক্তির অন্যতম মার্গ বা পথ।

৩. বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র। ধর্মচক্র প্রবর্তন মানে প্রকৃত ধর্ম বা সত্যজ্ঞানের উন্মোচন বা প্রদর্শন কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এই সূত্রেই আছে বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি চতুরার্য সত্য এবং সংসার-দুঃখ থেকে বিমুক্তি লাভের অমোঘ পন্থা স্বরূপ মধ্যপথ তথা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দেশনা।

৪. জাতিস্মরের অর্থ কোনো জাতির স্মরণ নয়, জন্মকে স্মরণ করা। ভগবান বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন জাতকের কাহিনীতে। বুদ্ধের জাতকের গল্প থেকে আমরা তাঁর বহু জন্মের বিবরণ জানতে পারি।

সানন্দা-সম্পাদিকা অপর্ণা সেন, ২৪ জুন ১৯৯৪/৯ আষাঢ় ১৪০১, ৮ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যা। প্রবন্ধ: জাতিস্মর গবেষকদের চোখে মণিশঙ্কর দেবনাথ।

Dhaka University Institutional Repository

MŠcwÄ

K. evsjv, cwj I ms¯‹Z fvlvi MŠmgn

১. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০

২. জীতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

৩. ড. বেলু রানী বড়ুয়া এবং ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বুদ্ধ বাণীর মূলতত্ত্ব পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১০

৪. ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বৌদ্ধ উপাখ্যান: রসবাহিনী, প্রেস- প্রকাশনা কমিটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ২০০৯

৫. ড. বেলু রানী বড়ুয়া, থেরীগাথা, বাংলাদেশ রিসার্চ ফর বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ঢাকা, ২০০৪

৬. ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া ও সুদীপ্তা বড়ুয়া, জিনচরিত (গৌতম বুদ্ধের জীবনেতিহাস), কুশলায়ন প্রকাশনা পরিষদ, কক্সবাজার, ২০১৪

৭. ড. বেলু রানী বড়ুয়া, পালি অট্ঠকথা সাহিত্য, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১২

৮. ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রানী বড়ুয়া, পালি উপ্পাদক লিখন বিধি, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, ঢাকা, ২০১৩

৯. শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি স্থবির, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, চট্টগ্রাম, ১৯৯২

১০. অমল বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ, কলিকাতা, ১৯৮৭

১১. শ্রী শরৎকুমার রায়, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯২৪

১২. ড. সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৭

১৩. ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৬

১৪. স্বামী বিদ্যারণ্য, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষদ, কলিকাতা ১৯৮৪

১৫. প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী, বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

১৬. শ্রীমৎ ধর্মকীর্তি স্থবির, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, চট্টগ্রাম ১৯৯২

১৭. চারুচন্দ্র বসু, ধম্মপদ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯০৪

১৮. ধর্মাধার মহাস্থবির, ধম্মপদ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৫৪

১৯. গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া, ধম্মপদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৭

২০. রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির সম্পাদিত ও অনূদিত, মহাপরিনিব্বান সুত্তং, চট্টগ্রাম, ১৯৪১

২১. শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির সম্পাদিত ও অনূদিত, ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খন্ড, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬২

২২. ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বাঙ্গালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, আবির প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ২০১৭

২৩. মহাস্থবির ধর্মকীর্তি, ধম্মপদট্ঠকথা, ২য় খন্ড (অপ্পমাদ বগ্গো), বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংসদ, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯

২৪. শ্রী প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, আর্যসত্য পরিচয়, ধর্মদূত বিহার, রেঙ্গুন, ১৯৫১

২৫. পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত, রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শন, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪০১

২৬. অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনূদিত, বুদ্ধচরিত, ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৩

২৭. প্রবোধচন্দ্র সেন, ধম্মপদ পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৫৪

২৮. তারাপদ ভট্টাচার্য অনূদিত, বুদ্ধচরিতম্, সংস্কৃত সহিত্য ভান্ডার, কলিকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৯

২৯. বারিদবরণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত বামন, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৪৮

৩০. ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতক, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা, ১৩৮৫

৩১. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, জাতক সমগ্র, কলিকাতা, ১৯৯৫

৩২. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

৩৩. শ্রীমৎ ধর্মপাল ভিক্ষু, জাতক নিদান, কলিকাতা, ১৩৫৯

৩৪. শ্রী বংশদ্বীপ মহাস্থবির, পঞ্ঞা ভাবনা, কলিকাতা, ১৯৩৬

৩৫. বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, সত্যদর্শন, চট্টগ্রাম, ১৯৫৩

৩৬. শ্রী আনন্দমিত্র মহাস্থবির, সত্যসংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৮৪

৩৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধধর্ম, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০২

৩৮. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, বুদ্ধের অভিযান, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৭

৩৯. ড. অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম, ৩য় সংস্করণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৭

৪০. রবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ- দেশকাল ও জীবন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৫

৪১. শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৮

৪২. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩০৮

৪৩. শ্রী হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০১

৪৪. সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া, মহাকারুণিক বুদ্ধ, অন্তিকা প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩

৪৫. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, রাজধানী প্রিন্টিং, কলিকাতা, (সন উল্লেখ নেই)

৪৬. সুদর্শন বড়ুয়া, প্রশ্নোত্তরে ত্রিপিটক (২য় খন্ড), আবুল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, চট্টগ্রাম, ২০০৬

৪৭. ড. মনিকুন্তলা হালদার (দে), বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৬

৪৮. ড. সুকোমল চৌধুরী, মহামানব গৌতম বুদ্ধ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০২

৪৯. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ললিত বিস্তর : ভগবান বুদ্ধের জীবন চরিত, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৯

৫০. জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, বুদ্ধ : গৌতম জীবনী, শিখা দেওয়ান, রাঙ্গামাটি, ২০০৮

৫১. সুকুমার ভট্টাচার্য, গৌতম বুদ্ধ, জীবনী; নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা, ২০০৩

৫২. রাহুল সংস্কৃত্যায়ন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য, গৌতম বুদ্ধ, চিরায়ত, কলিকাতা, ২০০৪

৫৩. সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষন, বুদ্ধদেবঃ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সম্পূর্ণ জীবন চরিত ও উপদেশ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ২০০৩

৫৪. লালিম হক, গৌতম বুদ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

৫৫. ভিক্ষু শীলভদ্র, বৌদ্ধ নীতি শিক্ষা (বঙ্গানুবাদসহ), মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, (সন উল্লেখ নেই)

৫৬. ভিক্ষু শীলভদ্র, থেরীগাথা, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৪৫

৫৭. ভিক্ষু শীলভদ্র, ধম্মপদ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৩

৫৮. জয়নাল হোসেন, মানবপুত্র গৌতম : ধর্ম ও জীবনাচার, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩

L. cwj Bs‡iRx MŠmgn

1. Narada Mahathera, The Buddha and His Teachings, Buddhist Meditation Centre, Singapore, First edition, 1973
2. H. Oldenberg, Buddha, His life, His Doctrine, His Order; London, 1888
3. Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol-I,II, D.K. Print World (P.) Ltd., New Delhi, India, 1985
4. Ed. V. Trenckner and R. Chalmers, Jataka, Vols. I-VII, London, 1877-1897
5. Dr. Sumangal Barua, Buddhist Councils And Development of Buddhism, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta, 1997
6. R. G. Basak, Lectures on Buddha and Buddhism, Sambodhi Publication, Calcutta, 1959
7. Edward J. Thomas, The Life of the Buddha as legend and History, London, 1949
8. Dr. G. C. Dev, Buddha, the Humanist, Paramount Publisher, Dhaka, 1969.
9. T.W. Rhys Davids, History and Literature of Buddhism, Varanasi, India, 1970, 1975
10. Ed. P.V. Bapat, 2000 years of Buddhism, Govt. of India, New Delhi, 1919
11. H. G. Narman and L.S. Tailang, Dhammapada Atthakatha, 5 Vols, P.T.S. London, 1906-10
12. Ed., Rev. Richard Morris, Anguttara-Nikaya, Vols. I-ii, The Pali Text Society (PTS), London, 1882-88
13. Ed., Prof. E. Hardy, Anguttara-Nikaya, Vols. III-V, PTS, London, 1896-1900
14. Ed., P.L. Vaidya, Lalita-Vistara, Darbhanga, BST. No. 1, The Mithila Institute, 1958

15. Bu-ston, History of Buddhism, Pts. I & II, (Chos-h byng), Heidelberg, Institute for Buddhismus-Kande, 1932
16. Ed., Charles, S. Prebish, Buddhism: A Modern Perspective, London, The Pennsylvania State University, 1975
17. Coomaraswamy, Ananda, K., Buddha and the Gospel of Buddhism, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1972
18. Kalupama J. David, Buddhist Philosophy- A historical Analysis, Honolulu, An East-West Center Book, 1933
19. Rhys Davids, The History and Literature of Buddhism, Bharatiya Publishing House, Varanasi, 1975
20. Rhys Davids, Buddhism, Indological Book House, Varanasi, 1973
21. Narendra Nath Bhattacharya, History of the Researches on Buddhism, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 1981
22. Sukumar Dutta, The Buddha and five after centuries, Sahitya Samsad, Calcutta, 1978
23. Arthur Lillie, The life of Buddha, Seema Publications, Delhi, 1974
24. A. K. Narain, Studies in History of Buddhism, D.R. Publishing Corporation, Delhi, 1980
25. Govind Parasad Pande, Studies in the Origin of Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi, 1974
26. Wolfgang. H. Schumann, Buddhism : An outline of its teaching and schools, Rider & Company, London, 1973
27. Ed. R. Morris, E. Hardy and C.A.F. Rhys Davids, Anguttaranikaya, London, 1961-81
28. Ed. Rajendralal Mitra, Lalitavistara, Paris, 1847-48
29. T.W. Rhys Davids, Dialogues of Buddha, Luzac, London, 1956
30. Anagarika Dharmapala, The life and teachings of Buddha, Mahabodhi Society, Calcutta, 1938

Awfavb

1. শান্ত রক্ষিত মহাস্থবির, পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড), বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা-২০০১
2. শীলরত্ন ভিক্ষু সম্পাদিত, পালি-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০২
3. R.C. Childers, A Dictionary of the Pali Language, Rinsen Book Company, Tokyo, 1987
4. T. W. Rhys Davids & William Stede, Pali- English Dictionary, P.T.S. London, 1975
5. V. Trenckner, A Critical Pali Dictionary, Copenhagen, 1924-1994
6. Nyanatilok Thera, A Buddhist Dictionary, BPS, Kandy, 1950
7. G. P. Malalasekara, Dictionary of Pali Proper Names, Vol-I & II, Delhi, India, 1980

Rvbv©j

1. Indian Historical Quarterly Sep. Vol. 5, 1925 (IHQ)
2. Indian Historical Quarterly Vol. 4, 1928 (IHQ)
3. Indian Historical Quarterly, Vol. 5, 1928 (IHQ)
4. Journal of the Oriental Institute of Baroda, Vol. XI, Pt. 3
5. Journal of the Pali Text Society, London, 1883 (JPTS)
6. Journal of Religion and Religions Vol. 2, 1972
7. Journal of the Pali Text Society, Vol. 15, 1990

=== ০ ===